গবাদি পশুখাদ্যে ঘাস

চাষ উৎপাদন ও সংরক্ষণ

এ, কে, সাহা

গবাদি পশুখাদ্যে ঘাস

চাষ উৎপাদন ও সংরক্ষণ

১৫-৭৮

এ, কে, সাহা

পরিবেশক
অন্নপূর্ণা প্রকাশনী
৩৬, কলেজ রো, কলিকাতা:৯

প্রকাশক :—
শ্রীঅপরাজিত সাহা
৪১, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন।
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৮৩

মূল্য — তিরিশ টাকা

মুদ্রণ
শক্তিরঞ্জন মিশ্র
ইউনাইটেড প্রিন্টার্স
৩০২/২/এইচ আচার্য্য পি, সি রোড
কলিকাতা

স্বর্গীতঃ মোষ্ট রেভারেণ্ড ফাদার জন স্কীল্‌ডার
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে

ভূমিকা

আমাদের বাংলায় সারা, বছর ধরে গবাদি পশুর জন্য ঘাসের চাষ ও কাঁচা ঘাসের যোগান রাখা একটা বিজ্ঞান সম্মত প্রযুক্তি। পশ্চিম বাংলার আবহাওয়ার উষ্ণতা ও আদ্রতা, বৃষ্টিপাত ও সূর্য্যালোক এবং সাংবাৎসরিক ঋতু আবর্ত্ত ও জমির রকম ভেদ সর্ব্বোপরি ফসলের চরিত্রগত বৈশিষ্টকে সমন্বয়ে এনে দেওয়ার দায়িত্ব যারা নিয়েছেন, কর্ত্তব্যবোধে নিষ্ঠার প্রমান তারা রেখেছেন। সার্থক সম্প্রসারণবিদদের আর সম্প্রসারণকর্মীদের নিষ্ঠা ও নিরলস কর্ম প্রচেষ্ঠার। গোপালকরা বুঝতে পেরেছেন কাঁচা ঘাসের পুষ্টি-মূল্য এবং তাহা একক পরিপূরক। অধিক দুগ্ধ উৎপাদনের অবশ্য এবং একমাত্র নির্ভরযোগ্য ব্যয় সাশ্রয়কারি উপায়। গোপালকদের গবাদি পশু খাদ্য ঘাস উৎপদনের প্রবণতা বেড়ে চলেছে।

গো-খাদ্য কাঁচা ঘাসের চাষ উৎপাদন ও সংরক্ষণের কাজে বইখানি সার্থক ভূমিকা নিক্।

ডঃ কে. সি. সাহা
বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, নদীয়া

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

লাইন স্কেচ আঁকা ছবি

হাফ টোন ফটো ছবি

বাংলার গো-সম্পদ ও গবাদি পশুখাদ্য উন্নয়ণ সমস্যা

মানব সভ্যতার ক্রমবিবর্তন ও ক্রমবিবর্তনের ধারা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় মানুষ যেইদিন বন্যপশুকে গৃপালিত করিয়া তুলিবার প্রথম প্রয়াস পাইল, সেইদিন তাহার চিন্তায় ছিল প্রকৃতির উপর বিজয় অভিযান চালাইবার উদগ্র আগ্রহ। গৃহপালিত করিয়া তুলিবার জন্য পশু নির্বাচন ছিল মূল চিন্তার আকর, কেননা নির্বাচিত পশু শুধু খাদ্য হিসাবেই নয়, পশুর শ্রমকে কাজে লাগাইবার স্বপ্ন তাহাদের আরো বেশী উদ্দীপিত করিয়া তুলিত। সভ্যতার বিবর্তনে ছোট ছোট দল বা গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের এইটি ছিল এক গতিশীল, বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। বুদ্ধির প্রয়োগে অক্ষত অবস্থায় বন্যপশুকে ধরিয়া কেলিবার কৌশল তাহারা বাহির করিল, শৃংখলিত করিয়া বন্যপশুর বন্যতাকে অবদমন করিয়া নিয়ন্ত্রণে আনিল, ক্রমান্বয়ে স্বভাবে নিরীহ করা হইল। সভ্যতাকামী মানবগোষ্ঠী আকাশের পানে হাত বাড়াইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাইল আর বলিল—"হে ঈশ্বর তুমিতো বলিয়াছ তোমার সৃষ্ট জীবকুলে মানুষই তোমার শ্রেষ্ঠ সৃজন। ভালবাসিয়া তাহাদের তুমি জীব-জগতের কর্তৃত্ব করিবার অধিকার দিয়াছ। তোমার মহিমা অপার ধন্য তোমার মহাশক্তির কেননা পশুসম্পদ তুমি মানুষকে উপহার দিলে।"

ক্রমবিবর্তনে মানুষ সমাজবদ্ধ হইল। বুদ্ধি ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধিত হইল—মানুষ সভ্য হইল। তাই সভ্যতাকামী মানবসমাজ তাহাদের পূর্ব-সুরীদের অবদান শ্রদ্ধার সহিত মাথা পাতিয়া লইল আর মহা কর্তব্যের দায়িত্ব নিষ্ঠার সহিত পালনের প্রতিশ্রুতি রাখিল, সেইদিনের সেই পশুসম্পদ আজকের এই পশুসম্পদে রূপান্তরিত হইল। পূর্বসূরীরা তাহাদের কর্তব্য নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান মানব সভ্যতা এই পশুসম্পদ হইতে খাদ্য ও পানীয়ের প্রায় এক তৃতীয়াংশ মিটাইতেছে। সার্থক মানবসভ্যতা সার্থক পূর্বসূরীর অবদান।

সেইদিন প্রথমদিন—যেইদিন প্রথম বন্যপশু অক্ষত অবস্থায় ধৃত হইয়াছিল—শৃঙ্খলিত হইয়াছিল আর কর্ত্তব্যবোধে ধৃত সেই বন্যপশুর খাদ্য যোগানের দায়িত্ব নিয়াছিল সেই আদিম পুরুষটি কেননা বন্য শৃংখলিত পশুকে অবাধ

বিচরণ প্রশ্নাতীতভাবে নিষিদ্ধ করিতে হইয়াছিল ততদিন পর্যন্ত যতদিন পর্যন্ত না সন্দেহাতীতভাবে ও সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য ভাবে সে পোষ মানিয়াছিল। কে জানে এই পোষ মানার কাল কত দীর্ঘ হইয়াছিল বা ধৃত-বন্যপশুর কতো পুরুষ সময় লাগিয়াছিল! শুধু খাদ্যের যোগান রেখেই ক্ষান্ত ছিলেন না এই শ্রদ্ধেয় আদিম পুরুষটি—সকলরকম সুযোগ সুবিধার সহিত যৌন জীবনকেও ফিরাইয়া দিয়াছিলেন এই ধৃত, শৃংখলিত বন্য পশুদের। শুধু বিনিময় বশ্যতা। বংশ, বশ্যতার স্বীকৃতি নিয়ে বংশ আর তাহা ক্রমাগত যতোদিন না প্রকৃতিতে বন্যতার অবলুপ্তি ঘটাইয়া পোষমানা গৃহপালিত করিয়া তোলা সম্ভব হইয়াছিল। নিষ্ঠার সহিত কর্তব্যবোধ, মনোবলের সহিত ধৈর্য্য, আর চিন্তায় মহাজ্ঞানী সেই আদিম পুরুষটি, যাহার মাধ্যমে মানুষ এই পশুসম্পদ উপহার পাইল।

আজকের সভ্য মানুষেরাও কিন্তু সেই স্মরণীয় আদিম পুরুষটির দেওয়া সংজ্ঞা নিষ্ঠার সহিত মানিয়া চলিতেছে। পশু-সম্পদকে নিষ্ঠার সহিত খাদ্য ও পানীয়র সংস্থান করিয়া দেওয়া, যত্ন, পরিচর্য্যা ও সুচিকিৎসার প্রতিশ্রুতি, সেই সঙ্গে স্বীকৃত পদ্ধতিতে প্রজনন অব্যাহত রাখা। কয়েক শতাব্দী যাবদ বিজ্ঞান অনেক অজানাকে নূতন নূতন ভাবে জানিতে সাহায্য করিতেছে। পশু চিকিৎসা লাভ করিয়াছে এক স্মরণীয় অধ্যায়। পশুচিকিৎসা যেমন আধুনিকতম পর্য্যায়, তেমন পশুখাদ্যের উৎপাদন ও সংরক্ষণ, পুষ্টি স্বাস্থ্য ও উন্নত প্রজননের সুসামঞ্জস্যর সমাহার এই পশু বিজ্ঞান। আজকের পশু-বিজ্ঞান হিসাব নিতে পারে নিকাশ দিতে পারে, কি-কেন-কেমন-কত-কখন ইত্যাদি সকল প্রশ্নের আর তার প্রযুক্তি কর্মধারায় রূপান্তরিত হইতেছে।

উন্নতিশীল ভারতের বৃহত্তর কর্মযজ্ঞে পশু-সম্পদের উন্নতিকল্প এক বিশেষ গুরুত্ব পাইয়াছে। বাংলা তাহার অংশীদার। প্রযুক্তি আর কর্মনিষ্ঠার সুফল বাংলা পাইতেছে। বাংলা গর্বের দাবী রাখে—অনেক প্রতিকুল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও পশু-সম্পদ উন্নত রাজ্যগুলি থেকে পিছাইয়া নেই বরং কোন কোন ক্ষেত্রে আগাইয়া আছে। পশুসম্পদে উন্নত রাজ্যগুলিতে তাহাদের নিজেদের স্বীকৃত উন্নত ও অধিক উৎপাদনক্ষম গো-সম্পদের জাতি ও প্রজাতির স্থায়ি বাস চলিয়া আসিতেছে সেই বেদের যুগ থেকেই পক্ষান্তরে বাংলায় তেমন গো-সম্পদের উন্নত জাতি বা প্রজাতির বসবাস ছিল না, পরন্ত বাংলার গো-সম্পদ অবক্ষয়ের শেষ ধাপে ছিল, বলতে গেলে অবলুপ্তির ক্ষণ গুণিতেছিল। বাংলা শক্ত হাতে প্রতিরোধ করিয়াছে এই অবক্ষয়ের,—নীর্ভিক প্রতিশ্রুতি রাখিয়াছে—আর অবক্ষয় নহে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আর ঐকান্তিক ও সুষ্ঠ কর্মনিষ্ঠাই ইহার

চাবিকাঠি। বাংলা তাহার জটিল জটিল সমস্যাগুলির অনেক জট খুলিয়া দিয়াছে আরো যাহা রহিয়াছে—খোলা হইতেছে এবং হইবেও। কারণ বাংলা উত্তরসূরীদের নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ভৌগলিক বিচারে বাংলার আয়তন খুবই ছোট। সর্বভারতীয় সমীক্ষায় তুলনামূলকভাবে অন্যান্য রাজ্যের চাইতে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যা ও বসতি বেশী অথচ শিল্পে উন্নত বাংলার আবাদ যোগ্য ভূমি সীমিত, ফলনশীল ভূমি আরো সীমিত এবং উর্বরা কৃষিভূমি আরো অধিক সীমিত অথচ জনসংখ্যার চাপ নিয়ন্ত্রণবিহীন, সংখ্যাতীতভাবে ক্রমবর্ধমান। বাংলার নিজস্ব জনসম্পদ, অগুন্তি ভাগ্যান্বেষি আগন্তুক বাসিন্দা ও ভীতিপ্রদ জন্মহার ইহার কারণ। পশুজাত খাদ্য ও পানীয়ের চাহিদা ও যোগান স্বাভাবিকভাবেই বিব্রত আর এই চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য রক্ষা করা বেশ দুরূহ কেন না জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যদি নিয়ন্ত্রণে রাখা না যায় তাহা হইলে কোন উন্নয়ণমূলক কাজেরই স্থায়ী সুফল পাওয়া যায় না—ইহা সতঃসিদ্ধ। এমন অবস্থায় হয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণে আনিতে হইবে উন্নয়ণমূলক কর্মসূচীর পরিধিতে নয়তো জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার স্মরণে রাখিয়া উন্নয়ণমূলক প্রকল্প ও কর্মসূচী রচনা ও বাস্তবায়ণ করিতে হইবে আর এই দুইএর যে কোন পথকে একটি সময়সীমার মধ্যে নিবদ্ধ রাখিয়া একটি মোটামুটি স্থিতিশীল পর্যায়ে আনিয়া পেঁছাইয়া দিতে হইবে। পৃথিবীর সমস্ত উন্নত দেশগুলি তাহাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে নিয়ন্ত্রণে রাখিয়া উন্নয়ন কর্মসূচীরূপায়ণ করিয়াছে—স্থিতিশীল ও স্থায়ী ফললাভ করিয়াছে। পরবর্তী পর্য্যায়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বনাম উন্নত কর্মধারায় আনুপাতিক সংযোজন করিয়াছে।

বাংলার গো-উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি সরাসরি কৃষি নির্ভর হইয়া উঠুক যেননা কাঁচা ঘাষের চাষ উৎপাদন ও সংরক্ষণ ব্যপকতর হইয়া উঠে। যেহেতু উন্নতগবাদি পশুর স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও উৎপাদন ক্ষমতা বজায় রাখা আবশ্যক ও প্রকল্পাধীন। ধানের খড় খাদ্য প্রাণহীন সুতরাং উন্নত গবাদিপশুর খাদ্য হিসাবে অপাক্তেয়। উন্নত গবাদি পশুখাদ্য হিসাবে ধানের খড়ের উপর নির্ভরশীল হওয়া অবিধেয়। পরিপূরক খাদ্য হিসাবে যে পরিমাণ চূণি, ভূষি, খইল, শষ দানা ইত্যাদি অথবা সুষম খাদ্যের সংমিশ্রণ গবাদি পশুকে দৈনন্দিন দেওয়া প্রয়োজন, বাজার দর অনুসারে তাহা ব্যয়সাপেক্ষ হইয়া পড়িয়াছে। একজন প্রান্তিক গো পালকের পক্ষে দৈনন্দিন ও বরাবর যোগান রাখা সম্পূর্ণ অসম্ভব যদিনা তাহার গবাদি পশু উৎপাদনশীল অবস্থায় না থাকে। এমত

অবস্থায় কাঁচা ঘাস একক পরিপূরক ও গবাদিপশুর স্বাস্থ্য পুষ্টি ও স্বাভাবিক উৎপাদন বজায় রাখা সম্ভবপর।

সুষমখাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলি সুষমখাদ্যের কৃষি ও শিল্প উপজাত উপাদানগুলি এবং শষ্য ও শষ্যদানা বিভিন্ন রাজ্যের বাজার থেকে সংগ্রহ করিয়া থাকেন এমনকি কোন কোন উপাদানের উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকার ফলে বিভিন্ন রাজ্য নির্দিষ্ট পরিমানের সরবরাহই পাইয়া থাকেন। বাড়তি প্রয়োজন খোলা বাজার থেকে সংগ্রহ করিয়া মিটাইতে হয়। কখনো কখনো এক উপাদান ও শষ্যদানা যোগান না থাকিলে অনুরূপ ভিন্ন উপাদান ও শষ্যদানা বাজার হইতে সংগ্রহ করিয়া সুষমখাদ্য প্রস্তুত করিতে হয় এবং চাহিদা ও যোগান অব্যহত রাখিতে হয়। শষ্যদানা ও অন্যান্য উপাদানগুলির বজার দর উঠা নামার গড়ন্তর হিসাব রাখিয়া উৎপাদিত সুষম খাদ্যের বাজার দর এমন একটি পর্যায্যে আনিয়া বাঁধিয়া রাখেন যাহাতে পশু ও পশুজাত উৎপাদনের আয় উৎসাহ ব্যঞ্জক হয় না। সুষমখাদ্যের উৎপাদন ব্যয় বনাম পশুপাখী ও পশু-পাখীজাত উৎপাদনের বিক্রয়মূল্য এই দুই এর মধ্যবর্তী লাভের অংক এই দুই ভিন্ন উৎপাদনকারীদের মধ্যে বিভাজনের অনুপাত স্থিরীকরণ ও সুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার গুরুত্ব অনস্বীকার্য্য সত্য।

খড় উন্নত গবাদিপশুর খাদ্য হিসাবে অপাক্তেয়। কারণ ইহাতে খাদ্যপ্রাণ নাই বলিলেই চলে। সুতরাং খড় খাওয়াইতে হইলে খড়ের সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমানে সুষম খাদ্য অবশ্যই দিতে হইবে। কেননা সুষম খাদ্যের পুষ্টিমূল্য দ্বারাই দেহরক্ষা ও উৎপাদন ক্ষমতা কেবলমাত্র বজায় রাখা সম্ভব। নীরস খাদ্য খড় ও সেই সঙ্গে যে পরিমাণে সুষম খাদ্য দৈনন্দিন পরিপূরক খাদ্যের দরকার হিসাবে দিতে হয় তাহার বাজার মূল্য বনাম কাঁচা ঘাস ও কাঁচা ঘাসের সঙ্গে অল্প যে পরিমাণ সুষম খাদ্যের দরকার হয় তাহার বাজার মূল্য প্রায় অর্ধেক বা অর্ধেকের অল্প কিছু বেশী। সুতরাং গবাদিপশু প্রতিপালনে কাঁচা ঘাস উৎপাদন আর্থিক দিক থেকে অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য কিন্তু বাংলায় আবাদযোগ্য ভূমি কম থাকায় এবং জনসংখ্যার চাপে অর্থকরী ফসলের বিশেষ চাহিদা থাকার জন্য গবাদি পশু খাদ্যের চাষ গৌণ হইয়া আছে। পশুখাদ্য উন্নয়নে বাধা হইয়া আছে যে কারণগুলি তাহা হইল গোপালকদের যে শ্রেণীর হাতে প্রচুর আবাদি জমি আছে অথচ তাহারা ঠিক ঠিক ভাবে জানিতেন না গোখাদ্য ঘাস চাষের পদ্ধতি ও প্রণালী, সারা বছর নাগাদ পশুখাদ্য ঘাষের চাষ হইতে পারে এবং বছরের সকল সময়েই কাঁচা ঘাসের

যোগান দেওয়া সম্ভব হইতে পারে, চাষের উদ্‌বৃত্ত কাঁচা ঘাসের সংরক্ষণ ইত্যাদি। গো-পালকদের যে শ্রেণীর হাতে অল্প আবাদি জমি আছে তাহারা সকলেই অর্থকরী ফসল তুলিবার জন্য উদগ্রীব। আবার যে শ্রেণীর গো-পালকদের হাতে আবাদি জমি নাই বলিলেই চলে তাহাদের সমস্যা আরো জটিল। ইহার সহিত জড়ানো আছে কৃষি অগ্রগতির ভারসাম্য যেমন বীজ, সার সেচ ইত্যাদি। এই সমস্ত বিবিধ অবস্থা মোকাবিলার জন্য আজকাল বাংলার গো-পালকেরা সচেতন। প্রথম শ্রেণীর গোপালকেরা যাহাদের হাতে প্রচুর আবাদি জমি রহিয়াছে তাহারা সারা বছর পর্য্যায়ক্রমে গবাদি পশুর জন্য ঘাসের চাষ করিতেছেন। সরকারী প্রচার কারিগরি সহযোগীতা ও সময়মতো বীজ সরবরাহই এই গতিশীলতা আনিয়া দিয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর গোপালকেরাও ঘাস চাষের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়াছেন। দুই অর্থকরী ফসলের মধ্যবর্তী সময়ের উপযোগী ঘাস উৎপাদন করিতেছেন। কারিগরি সহযোগীতা ও সময়মতো বীজ সরবরাহই ইহার প্রধান সহায়ক হইয়াছে। তৃতীয় শ্রেণীর গোপালকরা যাহাদের হাতে আবাদযোগ্য জমি মোটেই নাই বলিলেই চলে তাহাদেরও বিশেষ ধরণের ঘাস যাহা গোয়ালঘরের আশেপাশে, ডোবা বা নালার ধারে, পুকুরপাড়ে বা পতিত জমিতে চাষ চলিতে পারে, এমন ধরণের ঘাস চাষের জন্যে সরকারী কারিগরি সহযোগীতা অব্যাহত রাখায় আশাপ্রদ ফললাভ করা যাইতেছে। সকল শ্রেণীর গোপালকেরা আজকাল বুঝিতে পারিয়াছে গোপালনের আর্থিক দিক ঘাস উৎপাদনের উপর ভয়ানক ভাবে নির্ভরশীল এবং ঘাসের পুষ্টিমূল্য একক ও প্রাকৃতিক ভাবে সুষম।

গবাদি পশুর খাদ্য ও খাদ্য খাওয়াইবার নীতি

গবাদি পশুদেহের বৃদ্ধি, পুষ্টিসাধন, দৈনন্দিন কার্য নির্বাহের শক্তি সৃষ্টি, দেহের ক্ষয় পূরণ ও ক্ষয় নিবারণ, দুগ্ধ সৃজন ও বংশবৃদ্ধির জন্য পরিমিত পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ান দরকার। দৈনন্দিন গবাদি পশুর পুষ্টির প্রয়োজনিয়তা এবং যোগান দেওয়া খাদ্যের পুষ্টিমূল্য ইত্যাদির উপর সম্যক ব্যবহারিক জ্ঞান থাকিলে পশু পালনের কাজ সহজ হয়। পশুখাদ্যের উপাদান জল, শর্করা জাতীয় উপাদান, স্নেহজাতীয় উপাদান, আমীষ জাতীয় উপাদান, খনিজ পদার্থ ও খাদ্যপ্রান। গবাদি পশুদেহে শতকরা ৭০ ভাগ থেকে ৯০ ভাগ জল। জল খাদ্য পরিপাকে ও দেহের দূষিত পদার্থের নির্গমনে সাহায্য করিয়া পুষ্টিসাধন, বৃদ্ধি, ও গঠনে সাহায্যে করে। দুগ্ধবতী গাভীর জল অবশ্য প্রয়োজনীয় কেননা গো দুগ্ধের প্রায় ৮৭ ভাগই জল। শর্করা জাতীয় উপাদান দেহের তাপ উৎপাদন করে, দেহে বাড়তি শর্করা স্নেহজাতীয় পদার্থে রূপান্তরিত হয়। স্নেহ জাতীয় উপাদান শরীরে তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে এবং ইহা শর্করা চাইতে আড়াই গুন বেশী শক্তি উৎপাদন করিতে পারে। আমীষ জাতীয় উপাদান দেহের পুষ্টিবৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। খাদ্যপ্রান এমনই কতোগুলি প্রয়োজনীয় উপাদান যাহার অভাব ঘটলে শরীরে রোগ ও অসুস্থতা দেখা দেয়। খাদ্যপ্রান নানাভাবে রোগ প্রতিরোধ করে, ভিন্ন ভিন্ন পুষ্টিবৃদ্ধি ও উৎপাদনে সাহায্যে করে। যেমন খাদ্যপ্রান 'এ' রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, নৈশ অন্ধতা ও চর্মরোগ প্রতিরোধ করে এবং দেহের বৃদ্ধি ঘটায়। খাদ্যপ্রাণ 'বি'—ইহার অভাবে বদহজম হয়, পলিনিউরাইটিস রোগ জন্মাইতে পারে। খাদ্যপ্রাণ 'সি'—এর অভাবে রক্ত তারল্য ও দাঁতের রোগ দেখা দিতে পারে। খাদ্যপ্রাণ 'ডি'—ইহার অভাবে হাড়ের পুষ্টি হয়না ও রিকেট রোগ হয়। খাদ্যপ্রাণ 'ঈ'—র অভাবে পেশীর রোগ হইতে পারে, এবং বন্ধ্যাত্ব হয়। সুতরাং খাদ্যপ্রাণ এক অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। খনিজ পদার্থ পরিপাক ক্রিয়ার জন্য, রক্তের চাপ নিয়ন্ত্রনের জন্য, গ্রন্থির রস ক্ষরণের জন্য এবং অন্যান্য শারীরিক প্রক্রিয়ার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়।

গবাদি পশুখাদ্যের শ্রেণীবিভাগ করিলে—(ক) পেট ভরানোর জন্য খাদ্য ও (খ) সারবান খাদ্য, হিসাবে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। এই পেট ভরানোর জন্য খাদ্যকে আবার দুইভাগে ভাগ করা হয়। (ক) নীরস খাদ্য (খ) সরস খাদ্য। নীরস খাদ্য বলিতে আমরা খড় শুষ্ক ঘাসকে বুঝাই। খড় বলিতে ধানের খড়, গম ও যবের খড় ইত্যাদি আর শুষ্ক ঘাস বলিতে বরবটি, বারসীম, লুসার্ণ ওটস্ ইত্যাদি ঘাসের শুষ্ক অবস্থাকে বুঝায়। পেট ভরানোর খাদ্য হিসাবে আমাদের দেশে ধানের খড়ের প্রচলনই চিরাচরিত এবং অধিক পরিমানে হইয়া আসিতেছে। গবাদি পশুর পেট ভর্তি না হইলে প্রথম পাকস্থলী কাজ করে না কারণ গবাদি পশুর প্রথম পাকস্থলীতে কোন পাচক রস থাকে না কিন্তু এমন কতোগুলি জীবানু থাকে যাহারা ছিবড়া যাতীয় খাদ্যকে পরিপাক করিতে কেবলমাত্র সাহায্যে করে। খড়ের ভিতর আমিষ জাতীয় উপাদান কিছুই থাকে-না কিন্তু সুপাচ্য পুষ্টির উপাদান আছে সেইজন্য পেট ভরানো ছাড়া বলিতে গেলে ইহার আর কোন উপকারিতা নাই। ধানের খড়ে ক্ষার জাতীয় পটাশ ও অক্সালেটের পরিমান বেশী থাকে। অক্সালেটের অধিকাংশই গবাদি পশুর প্রথম পাকস্থলীতে পচিয়া যায় ইহা ছাড়া পটাশ ও অক্সালেটের জন্য খাদ্যের ক্যালসিয়াম পরিপাকেও ব্যাঘাত ঘটে। খড় জলে ভিজাইয়া রাখিলে পটাশ ও অক্সালেট জলে দ্রবীভূত হইয়া যায়। সুতরাং গবাদি পশুকে খড় খাওয়াইবার কয়েক ঘন্টা আগে জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয় এবং পরে পরিস্কার জলে ধুইয়া খাওয়াইলে পটাশ ও অক্সালেট জনিত দোষ থাকে না। পরবর্তী অধ্যায় খড় ও শুষ্ক ঘাস সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। সরস খাদ্য বলিতে আমরা কাঁচা ঘাসকে বুঝাই। এই কাঁচা ঘাসকে আমরা আবার তিন ভাগে ভাগ করিয়া থাকি। (ক) ঘাস (খ) শাক সব্জী ও (গ) সাইলেজ, ঘাস বলিতে নেপিয়ার ঘাস, প্যারা ঘাস, জোয়ার ভুট্টা, টিওসিনটি, গাই-মুগ, বিশাল-মুগ মটরশুটি, বরবটি, বারসীম, লুসার্ণ ওটস ইত্যাদিকে বুঝাই। এই সকল ঘাসের পুষ্টিমূল্য ও রাসায়নিক সংযুক্তির বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী অধ্যায় দেওয়া হইল। শাকসব্জী বলিতে কাঁটা-নটে, গাজর, বাঁধাকপি, লাল-আলু ইত্যাদি বোঝায়, সাইলেজ বলিতে আমরা ঘাস সংরক্ষণ করিবার পদ্ধতিকে বুঝাই। পরবর্তী অধ্যায় ইহা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

ঘনীভূত খাদ্য বলিতে বীজ, শস্যদানা ও খৈলকে বুঝায়। অড়হর, মুগ ও বিউলি ডাল, ছোলা, ওটস্, বার্লী, ভুট্টা, জোয়ার ইত্যাদি শষ্যদানা ও সরিষার খৈল, বাদামের খৈল, তিলের খৈল, তিসির খৈল প্রভৃতি। শষ্যদানায়

রহিয়াছে শতকরা ৬—৮ ভাগ আমীষ উপাদান ও প্রায় ৭০ ভাগ সুপাচ্য অংশ।

ভুট্টা-শষ্যতে আছে ৭'৪ ভাগ সুপাচ্য আমীষ জাতীয় উপাদান, ৮৪'৯ ভাগ সুপাচ্য পুষ্টিকর উপাদান। জোয়ার শষ্যে রহিয়াছে ৬'৫৭ ভাগ সুপাচ্য আমীষ জাতীয় উপাদান, ৭২'৬ ভাগ সুপাচ্য পুষ্টিকর উপাদান। গমে রহিয়াছে ৫'৬৭ ভাগ সুপাচ্য আমীষ জাতীয় উপাদান ৮৩'০ ভাগ সুপাচ্য পুষ্টিকর উপাদান। ছোলায় রহিয়াছে ১২'০ভাগ আমীষ জাতীয় উপাদান, ৭৪'৬ ভাগ সুপাচ্য পুষ্টিকর উপাদান। ডালে রহিয়াছে প্রায় ৮ ভাগ আমীষ জাতীয় উপাদান, কোন কোন ডালে তারও বেশী। খৈলে রহিয়াছে ১৯-৪০ ভাগ আমীষ জাতীয় উপাদান আর সুপাচ্য অংশ রহিয়াছে শতকরা ৬৪-৮০ ভাগ। সরিষার খৈলে রহিয়াছে ২৭'৬১ ভাগ সুপাচ্য আমীষ জাতীয় উপাদান, ৭৪'২ভাগ সুপাচ্য পুষ্টিকর উপাদান। তিসির খৈলে ২৩'২৭ ভাগ আমীষ জাতীয় উপাদান, ৬০'৬ ভাগ সুপাচ্য পুষ্টিকর উপাদান। চীনাবাদামের খৈলে ৪১'৭৫ ভাগ আমীষ জাতীয় উপাদান, ৭১'০ ভাগ সুপাচ্য পুষ্টিকর উপাদান। তিলের খৈলে আছে ৩৮'৩৪ ভাগ সুপাচ্য আমীষ জাতীয় উপাদান, ৭৮'২ ভাগ সুপাচ্য পুষ্টিকর উপাদান।

শষ্যের উপাজাত অংশ যেমন ধানের কুঁড়ো ও খুদ, গমের ভুষি, ডালের চুনি, ছোলার খোসা গুড় ইত্যাদি। ধানের কুঁড়োয় স্নেহ ও আমীষ জাতীয় উপাদান কম থাকলেও খনিজ পদার্থ বেশী থাকে। ডালের চুনিতে আছে শতকরা প্রায় ৮ ভাগ সুপাচ্য আমীষ উপাদান। মুগ ডালের চুনিতে রহিয়াছে ১১'০ ভাগ সুপাচ্য আমীষ জাতীয় উপাদান, ৬০.০ ভাগ সুপাচ্য পুষ্টিকর উপাদান। ছোলার চুনিতে ১০'৫ ভাগ সুপাচ্য পুষ্টিকর উপাদান, ৫৫.২ ভাগ সুপাচ্য পুষ্টিকর উপাদান রহিয়াছে। অড়হরের চুনিতে ৮'০ ভাগ সুপাচ্য আমীষ জাতীয় উপাদান, ৬৫.০ ভাগ সুপাচ্য পুষ্টিকর উপাদান রহিয়াছে। গমের ভুষিতে ৭.৮৫ ভাগ সুপাচ্য আমীষ জাতীয় উপাদান, ৬৩.৪ ভাগ সুপাচ্য পুষ্টিকর উপাদান। ধানের কুঁড়োতে আছে ৮'১৮ ভাগ সুপাচ্য আমীষ জাতীয় উপাদান, ৮৮.৫ ভাগ সুপাচ্য পুষ্টিকর উপাদান রহিয়াছে। গমের ভুষিতে শর্করা, ভিটামিন, ক্যালসিয়াম ও ফসফেট এবং গুড়ে রহিয়াছে ক্যালসিয়াম ও লোহ তাছাড়াও অধিক পরিমানে শর্করা ও সুপাচ্য পুষ্টিকর অংশ। খনিজ পদার্থ বলিতে খাদ্য লবন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ইত্যাদি বুঝায়। সুষম খাদ্যের সংমিশ্রণে শতকরা ২ ভাগ খনিজ পদার্থ দেওয়া যাইতে পারে। গবাদি পশু যদি কাঁচা ঘাস খায় তবে ক্যালসিয়াম

না দিলেও চলে। কেননা কাঁচা ঘাসে প্রচুর পরিমান ক্যালসিয়াম থাকে। কাঁচা ঘাস না খাওয়াইলে সুষম নির্দিষ্ট ২ শতাংশ খনিজ পদার্থের মধ্যে কিছু চা-খড়িও মিশ্রণ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

সুষম খাদ্য বলিতে আমরা বুঝি, উপযুক্ত পরিমানে এবং আনুপাতিক পরিমান পুষ্টিকর উপাদান বর্তমান খাদ্য। দেহরক্ষা ও উৎপাদনের জন্য উহা অবশ্য প্রয়োজনীয়। দৈনন্দিন পশুদেহের চাহিদা যোগানের হিসাব রাখাকেই খাদ্য-নীতি বলে। কোন খাদ্যের মধ্যে কতোটা সুপাচ্য পুষ্টিকর উপাদান আছে এবং তাহার কতোটা অংশ পরিপাক হইয়া পশুদেহের প্রয়োজনে লাগিবে তাহা জানিতে পারিলে সুষম খাদ্য প্রস্তুত করা সহজ ও সম্ভব হয়।

দৈনন্দিন পশুদেহের চাহিদায় প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট ইত্যাদির তাপ উৎপাদন ক্ষমতা এবং দৈনন্দিন পশুদেহ ইহার কতোটা অংশ পরিপাক করিতে সক্ষম তাহাও জানা থাকা আবশ্যক। সেই সঙ্গে পশুখাদ্যের পুষ্টিকর অনুপাত জানা থাকিলে সুষম খাদ্য প্রস্তুত করা আরো সহজ হয়। পশুখাদ্যের গুনাগুনের অনুপাত হিসাব করার সহজ উপায়—

$$\text{পুষ্টিকর অনুপাত} = \frac{\text{কার্বোহাইড্রেট} + (\text{ফ্যাট} + 2.25)}{\text{প্রোটিন}}$$

পশুখাদ্যে শুষ্ক পদার্থেরও শতকরা পরিমান জানা থাকা আবশ্যক। যেমন বারসীম, লুসার্ণ ঘাসে থাকে শতকরা ২০ ভাগ শুষ্ক পদার্থ। জোয়ার, ভুট্টা ইত্যাদিতে থাকে ২৫ ভাগ শুষ্ক পদার্থ, শষ্য দানা, খইল ইত্যাদিতে আছে শতকরা ৯০ ভাগ শুস্ক পদার্থ।

গবাদি পশুর দৈনন্দিন খাদ্য নির্ধারণ করিবার সময় পশুর দেহের ওজন জানা থাকা দরকার। দুগ্ধবতী গাভী হইলে, কত পরিমানে দুধ দেয় তাহাও জানা থাকা দরকার। সাধারণত, গবাদি পশুর শারীরিক ওজন জানিবার জন্য সহজ সূত্র—

(বুকের ছাতির ব্যাস)^2 × লম্বা (হিপ বোন থেকে পিন বোন পর্যন্ত্য ইঞ্চি পরিমাপে। অর্থাৎ কোমড়ের বের করা হাড় থেকে ঘাড়ের শেষ হাড় পর্যন্ত) এই গুণফলকে ৩০০ দ্বারা ভাগ করিলে—যে অংক বাহির হয় উহাই পশুর ওজন (পাউন্ড পরিমাণ)। প্রতি ১০০ পাউন্ড শরীরের ওজনের জন্য পেট ভরানো খাদ্য দেওয়া যাইতে পারে ৬ পাউন্ড। পেট ভরানো খাদ্যের মধ্যে সরস খাদ্য ও নীরস খাদ্যের হার সাধারণত ৩:১ হিসাবে ধরা হয়। অর্থাৎ ৬ পাউন্ডের মধ্যে ৩ পাউন্ড যদি কাঁচা ঘাস দেওয়া হয় তবে

১ পাউণ্ড শুষ্ক খড় দিলেই চলে। একটি ৫০০ পাউণ্ড শরীরের ওজন এমন পশুর পেট ভরানোর খাদ্যের প্রয়োজন ৫×৬=৩০ পাউণ্ড। এই ৩০ পাউন্ডের অর্দ্ধেক ১৫ পাউণ্ড যদি কাঁচা ঘাস দেওয়া হয় তবে বাকী ১৫ পাউণ্ডের জন্য শুষ্ক খড়ের প্রয়োজন হবে ১৫÷৩=৫ পাউণ্ড। একটি প্রাপ্ত বয়স্ক গবাদি পশু দেহের স্বাভাবিক ওজন অনুসারে প্রতিদিন নীরস খাদ্য বা শুস্ক খড় খাইবে ৫—৬ কিলো একক ভাবে, অথবা ১৫—১৮ কিলো কাঁচা ঘাস একক ভাবে, অথবা ৩:১ অনুপাত হারে সাড় সাত কিলো কাঁচা ঘাস, আড়াই কিলো শুকনো খড় অথবা ৯ কিলো কাঁচা ঘাস, ৩ কিলো শুকনো খড়। কাঁচা ঘাসের পরিমাণ বাড়লে খড়ের অনুপাত কমবে আবার খড়ের পরিমাণ বাড়লে কাঁচা ঘাসের অনুপাত কমবে।

এছাড়াও গবাদিপশুকে চারণ ভূমিতে চরতে দেওয়া উচিত। গবাদি পশুর গর্ভাবস্থায় কাঁচা ঘাসের পরিমাণ বাড়ানো দরকার কারণ সন্তান উৎপাদনের জন্য তখন দেহে অধিক পরিমাণে প্রোটিনের দরকার হয়। আবার সন্তান উৎপাদনের পরেও দেহের ক্ষয়পূরণ, পুষ্টিসাধনের জন্য এবং দুগ্ধ উৎপাদনের জন্য কাঁচা ঘাস অধিক হারে দেওয়া দরকার। বাছুরকেও দুধ ছাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে, কচি ঘাস খাইতে অভ্যস্ত করিতে হয় এবং ছয়মাস বয়সের পর হইতে সম্পূর্ণ তরুণ ও যৌবন বয়সে শষ্যদানার সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্যের সহিত যদি পেট ভরানোর খাদ্যের জন্য একক সরসখাদ্য কাঁচা ঘাস দেওয়া যায় তবে খুবই সুফল পাওয়া যায়। বাড়ন দ্রুত হয়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মায় এবং উপযুক্ত সময়ে গর্ভাধান করিতে সক্ষম হয়। সুতরাং কাঁচা ঘাসের প্রয়োজনীয়তা ও উৎপাদন অবশ্য এবং বিশেষ কর্তব্য।

সুষম খাদ্য প্রস্তুত করিবার ব্যবহারিক জ্ঞান মোটামুটিভাবেও যদি গ্রামীণ গোপালক ও চাষী ভাইদের থাকে তবে বাজারের উৎপাদিত সুষম খাদ্যের চড়া দামের হাত হইতে অনেকটা অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব হয়, ফলে পশু ও পশুজাত উৎপাদন ব্যয় অনেক পরিমাণে কম হইয়া আসে কেননা কৃষি ও কৃষি উপজাত অনেক দ্রব্যই চাষিভাইদের নিজস্ব খামারে উৎপাদিত হয়। তাছাড়াও চাউলের কুঁড়া, গমের খোলা, ডালের ভুষি ইত্যাদি স্থানীয় বাজার বা চাউল-কল, জাঁতা-কল ইত্যাদি হইতে স্বল্প মূল্যে সংগ্রহ করিয়া লইতে পারেন। সুষম খাদ্যে শষ্যের ব্যবহার এবং কোন কোন শষ্য, কখন, কেমনভাবে, কতো অংশ মিশাইতে হয় জানা থাকিলে, আপন আপন খামার হইতে, দুই অর্থ-

করী ফসলের মধ্যবর্তী সময়ে, তেমন সমস্ত ফসল উৎপাদন করিয়া লইতেও পারেন।

সুষম খাদ্য প্রস্তুত করিবার সহজতম পদ্ধতি—সংমিশ্রিত উপাদানে শতকরা কতভাগ প্রোটিন যুক্ত আছে তাহা জানা থাকা ও তাহার আনুপাতিক সংযুক্তি জানা থাকা দরকার। যে গাভী দুধ দেয় না, অথবা যে বলদ কাজ করে না তেমন গবাদি পশুর সুষম খাদ্যে শতকরা ১২ ভাগ প্রোটিন থাকিলেই চলে। যে সমস্ত উন্নত গাভী বংশগত কারণে নূন্যতম পরিমাণ দুধ দেয়—জার্সি গরু ৩—৪ কিলো, হলষ্টেইন গরু ৫-৬ কিলো, দেশী হরিয়ানা গরু ২-৩ কিলো, এমন গবাদি পশুকে ১২-১৪ ভাগ প্রোটিনযুক্ত সুষমখাদ্য দেওয়া যাইতে পারে। অধিক দুগ্ধ উৎপাদন অবস্থায় ঐ সমস্ত গবাদি পশুকে শতকরা ১৬-১৮ ভাগ প্রোটিন যুক্ত সুষমখাদ্য দেওয়া দরকার। শতকরা ২০-২২ ভাগ প্রোটিনযুক্ত সুষমখাদ্য বিশেষ উৎপাদনক্ষম গবাদি পশুকে দেওয়া হয় কেননা অধিক উৎপাদন ক্ষমতা ও পাশাপাশি দৈহিক মান বজায় রাখিবার জন্য ইহা প্রয়োজন।

বাঙলার বাজারে গবাদি পশুখাদ্যের জন্য যে সমস্ত শষ্যদানা পাওয়া যায় এবং বাংলার কৃষি ও কৃষি উপজাত দ্রব্য, সহজলভ্য তেমন কিছু পশু খাদ্যের সুপাচ্য আমীষ উপাদানের শতকরা হিসাব নীচে দেওয়া হইল।

শষ্যদানা—ভুট্টা—৭·৪%, জোয়ার—৬·৫৭%, বাজরা—৪·৫৭%, ওটস্—৮·০৭%, গম—৫·৬৭%, ছোলা—১২·০%, অড়হর—১২·৯২%, কলাই—১৮·০%, তিসি—১৪·০%, মুগ—১২·৬%।

কৃষি উপজাত দ্রব্য—ছোলাচুনি—১০·৫%, অড়হর চুনি—৮·০%, মুগচুনি—১১·০%, ধানের খুদ—৮·১৮%, গমের ভূষি—৭·৮৫%, ধানের কুঁড়ো—৮·১৮%, তিসির খৈল—২৩·২৭, তিলের খৈল—৩৮·৩১%, চীনা বাদামের খৈল—৪০·৭৫—, নারকেল খৈল—১৮·৯৯%।

সুষম খাদ্য প্রস্তুত করিতে কমপক্ষে উপরের যে কোন তিনটি উপাদান থাকা চাই যাহার সংযুক্তিতে ১২%—১৮% সুপাচ্য আমীষ উপাদানযুক্ত সুষমখাদ্য তৈরী হয়। খইল কোনও ক্রমেই শতকরা ৩৩ ভাগের বেশী না হয় এবং খনিজ পদার্থ সাধারণ লবণ শতকরা ২ ভাগ থাকে তাহা লক্ষ্য রাখিতে হয়। বাড়ন্ত গবাদিপশুর সুষম খাদ্যে অ্যামোনিয়াম লবণ ও ক্যালসিয়াম (চা-খড়ি) মিশানো চলে। সুষম খাদ্যে গুড় দেওয়া যাইতে পারে, যদিও গুড়ে কোন সুপাচ্য আমীষ উপাদান নাই কিন্তু অন্যান্য খনিজ পদার্থ প্রচুর

রহিয়াছে। সুষম খাদ্য প্রস্তুত করিবার সময় মনে রাখিতে হইবে, যে সমস্ত উপাদানের দাম সস্তা ও সহজলভ্য, তেমন সমস্ত উপাদানের সংমিশ্রণে সুষম খাদ্য প্রস্তুত করায় তেমন কোন সমস্যা দাঁড়ায় না।

মনে করুন আপনি আপনার খামারে ভুট্টা উৎপাদন করিয়াছেন, ছোলা উৎপাদন করিয়াছেন, তিলের খৈল আপনার খামারের কৃষি উপজাত দ্রব্য। ধানের কুঁড়া বাজারে সহজ প্রাপ্য। এই উপাদানগুলির সংমিশ্রণে যদি আপনি সুষম খাদ্য প্রস্তুত করিতে চাহেন তাহা হইলে কি, কতো ভাগ মিশাইলে, মিশ্রিত সুষম খাদ্যের সুপাচ্য আমীষ উপাদান কত ভাগ দাঁড়াইল তাহা নিম্ন সরণীসে দেখান হইল।

সরণী—১

ক্রমিকনম্বর	উপাদানের নাম	কত পরিমাণ মিশাইতে চান	শতকরা সুপাচ্য আমীষ উপাদান	মিশ্রিত খাদ্যে সুপাচ্য আমীষ উপাদানের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫
১।	ভুট্টা	৪৫ কে. জি.	৭·৪	৩·৪
২।	ছোলার চুনি	১৫ ”	১০·৫	১·৫
৩।	তিলের খৈল	২০ ”	৩৮·৩৪	৭·৬
৪।	ধানের কুঁড়া	২০ ”	৮·১৮	১·৬
		১০০ কে. জি.		১৪·১

সহজ অংক—১০০ কে.জি. ভূট্টায় ৭·৪ কে.জি. সুপাচ্য আমীষ উপাদান আছে। ১ কে.জি. ভুট্টায় কতো? ৪৫ কে.জি. ভুট্টায় কতো?

১০০ কে.জিতে — ৭·৪

১ ” — $\frac{৭·৪}{১০০}$

৪৫ ” — $\frac{৭·৪ \times ৪৫}{১০০} = ৩·৪$

এই পদ্ধতিতে মিশ্রিত প্রতিটি উপাদানের পরিমাণের আনুপাতিক সুপাচ্য আমীষ উপাদানের হিসাব বাহির করিয়া লইলে সুষম খাদ্য প্রস্তুত করা সহজ হয়। ১ নং সরণীর সংমিশ্রণের সুপাচ্য আমীষ উপাদান শতকরা ১৪·১ ভাগ।

সরণী—২

ক্রমিক নম্বর	উপাদানের নাম	যত পরিমাণ মিশাইতে চান	শতকরা সহপাচ্য আমীষ উপাদান	সুষম মিশ্রিত খাদ্যে সহপাচ্য আমীষ উপাদান
১	২	৩	৪	৫
১।	জোয়ার	৩০ কে.জি	৬·৫৭	১·৯৭
২।	গমের ভুষি	৪০ ”	৭·৮৫	৩·১৪
৩।	চীনাবাদামের খৈল	৩০ ”	৪১·৭৫	১২·৫০
		১০০ কে.জি		১৭·৬১

উপরে ২নং সরনীতে সংমিশ্রণে ১৭·৬১ ভাগ সহপাচ্য আমীষ উপাদান রহিয়াছে।

সরণী—৩

ক্রমিক নম্বর	উপাদানের নাম	যত পরিমাণ মিশাইতে চান	শতকরা সুপাচ্য আমীষ উপাদান	মিশ্রিত সুষম খাদ্যে সুপাচ্য আমীষ উপাদান
১	২	৩	৪	৫
	ওটস্	৩০ কে.জি	৮·০৭	২·৪
	গম	২৫ "	৫·৬৭	১·৪
	কলই	২০ "	১৮·০	৩·৬
	তিসির খৈল	২৫ "	২৩·২৭	৫·৮
		১০০ কে.জি		১৩·২

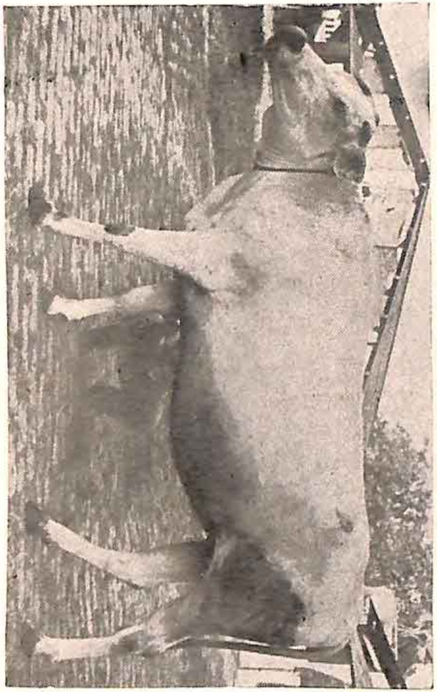
উপরে ৩নং সরণীতে সংমিশ্রণে ১৩·২ ভাগ সুপাচ্য আমীষ উপাদান আছে।

প্রতি সরণীতে দেখানো সংমিশ্রণের সঙ্গে দুই কিলো সাধারণ লবণ ও চা-খড়ি মিশিয়ে নেবেন। ইচ্ছা করিলে ২-৩ কে.জি গুড় মিশাইতে পারেন।

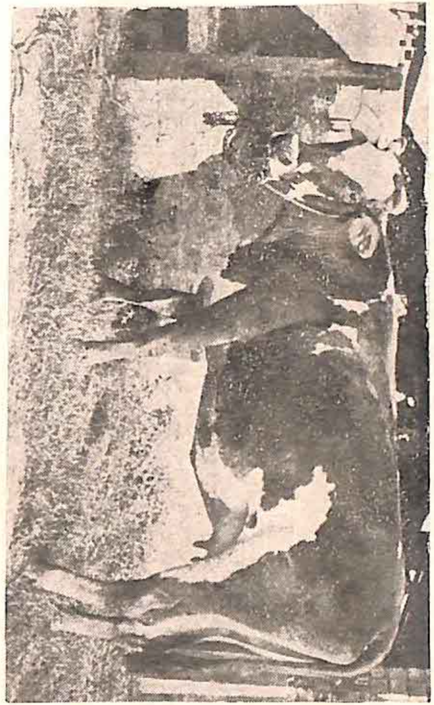
গবাদি পশুখাদ্য ফসলের শরীরবৃত্তীয় ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা

পশুখাদ্য ঘাসের জীবনকাল অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগের দিক থেকে নেপিয়ার ঘাস ও প্যারা ঘাস বহুবর্ষজীবি ঘাস। টিওসিনটি, ভুট্টা, জোয়ার, ওটস্, লুসার্ন, বরবটি ইত্যাদি বর্ষজীবি ঘাস। ব্যবহারিক শ্রেণী বিভাগের দিক থেকে ওটস্, ভুট্টা, জোয়ার ইত্যাদি খাদ্যশষ্য হইলেও এইক্ষেত্রে আমরা পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহার করি। মুগ, মটর, বরবটি কলাই ইত্যাদি ডাইল জাতীয় শষ্য হইলেও আমরা পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহার করি। কিন্তু নেপিয়ার ঘাস, প্যারা ঘাস, বারসীম, লুসার্ন ইত্যাদি ফসলকে আমরা পশুখাদ্য ঘাস হিসাবেই উৎপন্ন করি। প্রাকৃতিক বর্গ ও গোত্রানুযায়ী একপত্রবীজ বিশিষ্ট ঘাস জোয়ার, ভুট্টা, ওটস্ ইত্যাদিকে ধান্য গোত্রীয় (Gramenea), এবং বরবটি, কলাই, লুসার্ন, বারসীম ইত্যাদিকে দ্বিপত্রবীজ বিশিষ্ট বা শিম্ব-জাতীয় (Legumenosea) বলি। সাময়িক শ্রেণী বিভাগ করিয়া আমরা এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত যে সমস্ত ফসল উৎপাদন করি উহাকে খরিপ শষ্য বলি। এইসব ফসলে সাধারণত অধিক বৃষ্টিপাত, অধিক তাপ এবং অধিক আদ্রতার প্রয়োজন হয়। নেপিয়ার ঘাস, প্যারা ঘাস, টিওসিনটি, ভুট্টা ও জোয়ার ইত্যাদি ঘাস খরিপ কালীন ঘাস হিসাবে চাষ করা হয়। রবিশষ্য—সেপ্টেম্বর মাস হইতে মার্চ মাস পর্য্যন্ত যে সকল ঘাস চাষ হয় যেমন বারসীম, লুর্মান, ওটস্ ইত্যাদি, উৎপাদনে অল্প তাপ ও অল্প আদ্রতার প্রয়োজন কিন্তু জলসেচন প্রয়োজন হয় কারণ তখন বৃষ্টি জল কম পাওয়া যায়, এবং মৃত্তিকাস্থ জলের স্তর নীচে নামিয়া যায় বলিয়া উহা সহজলভ্য হয় না। বরবটি এবং ফ্যাসুলাস জাতীয় ঘাস রবি ও খরিপ উভয় ঋতুতেই চাষ করা চলে।

আবাদ প্রণালী অনুসারে ফসলের শ্রেণীবিভাগ জানিতে হইলে ফসলের শরীরবৃত্তীয় কারণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলি জানিতে হইবে কারণ অংকুরোদ্গমের সময় হইতে ফলন পর্য্যন্ত গাছকে বিভিন্ন করেণের উপর নির্ভর করিতে হয়। ইহার যে কোন একটির অভাব ঘটিলে গাছ বৃদ্ধি পায়না ফলনও



× জার্সি



× হলষ্টীন



বাংলার গাভী

হয়না। সেচন জল, বায়ু, তাপমাত্রা, আলোক, এবং মৃত্তিকাস্থ প্রয়োজনীয় খাদ্য ইত্যাদি। ফসলের খাদ্যউপাদানগুলির মধ্যে অক্সিজেন ও কার্বন আসে বায়ুমন্ডল হইতে। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন আসে জল হইতে। নাইট্রোজেন ফসফরাস, গন্ধক, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও লৌহ আসে মাটি হইতে। ইহা ছাড়া দস্তা, তামা, বোরণ ও ম্যাঙ্গানিজ এবং সিলিকন কোবাল্ট ও এ্যালুমিনিয়াম ফলনের জন্য প্রয়োজন হয়। সুতরাং পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলি ফসলের শরীরবৃত্তীয় কারণগুলির জন্য অত্যাবশ্যকীয় ও অপরিহার্য্য। এই সকল খাদ্যোপাদানের যথাযথ ব্যবস্থাপন করিতে পারিলে ফসল ও ফলন নিশ্চিন্ত করা অনেকটা সম্ভব হয়।

শষ্য জীবনে জলের প্রয়োজন অপরিহার্য কেননা জল বীজের মধ্যে সুপ্ত ভ্রূণকে জাগ্রত করে। ইহা উদ্ভিদ কোষের প্রোটপ্লাজমের অন্যতম ও প্রধান উপাদান, ইহার ৮০ থেকে ৯০ ভাগ জল। মৃতিকাস্থ জল রাসায়নিক, প্রাকৃতিক ও জৈবিক বিক্রিয়া ঘটায়। সালোক সংশ্লেষণে জল একটি প্রধান উপাদান, ইহা উদ্ভিদের শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে, মৃত্তিকাস্থ খনিজ লবণ দ্রবীভূত করিয়া উদ্ভিদ দেহে সংবাহিত করে এছাড়া উদ্ভিদ দেহের বিপাকীয় পরিবর্তনের জন্য জল অপরিহার্য্য।

বৃষ্টির জল, জল সেচন ও মৃত্তিকাস্থ জল থেকেই উদ্ভিদ জলের প্রয়োজন মিটায়। বৃষ্টির জল চুয়াইয়া মাটির নীচে চলিয়া যায় এবং রন্ধ্রপরিসরে অবস্থান করে এবং অতিরিক্ত জল স্থায়ী জলের স্তরে যাইয়া জমা হয়। বালিমাটিতে স্থূল রন্ধ্রপরিসর বেশী থাকে এবং এঁটেল মাটিতে সূক্ষ রন্ধ্রপরিসর বেশী থাকে। মাটিতে জলের পরিমাণ গড়ে উহার মোট ওজনের ৮—১৫ ভাগ থাকে। জল সেচন সাধারণত নদী, খাল ও পুস্করীনির জল হইতে সরবরাহ করা হয়। মৃত্তিকায় যদি জল ধারণের ক্ষমতা কম হয় তাহা হইলে জল সেচনের উদ্দেশ্য সম্যকরূপে সাধিত হয়না। আবার মৃত্তিকায় যদি জল ধারণের ক্ষমতা ও সংরক্ষণের ক্ষমতা থাকে তথাপিও অতিরিক্ত জল যাহাতে মাটির নীচে চলিয়া যাইতে পারে সেইজন্য উত্তম কর্ষণ দ্বারা মাটির উপরিভাগ আলগা করিয়া দিতে হয়। জলসেচনে জমির ঢালও বিবেচ্য বিষয়। প্রতি ১০০ ফুটে ১ ফুট ঢাল চলতে পারে। সেচনের জলে ক্ষার অথবা লবণের পরিমাণ যাতে বেশী না থাকে সে বিষয়ও নজর রাখা দরকার কেননা উহাতে মাটি ও শষ্য উভয়েরই ক্ষতি হয়।

মৃত্তিকাস্থ জল—সাধারণতঃ বৃষ্টির জল বা জল সেচনের জল মাধ্যাকর্ষণ

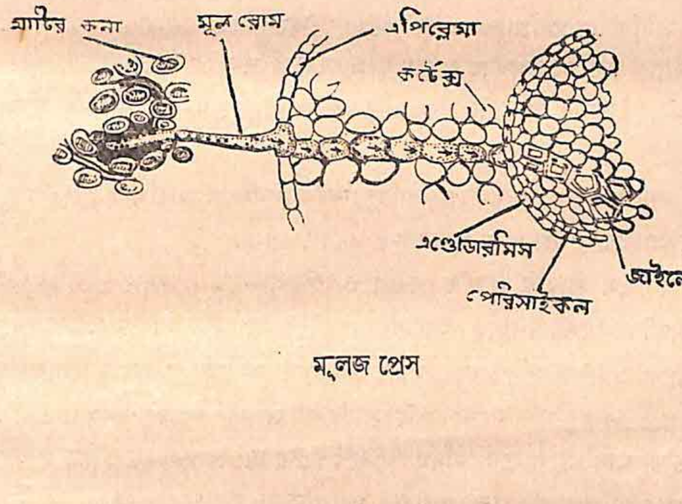
শক্তির প্রভাবে চুয়াইয়া নিম্নমুখে মাটির স্থূল রন্ধ্রপথে ঢোকে এবং রন্ধ্রমধ্যস্থ বায়ুকে আলোড়িত করে ও ক্রমান্বয়ে সূক্ষ রন্ধ্রপরিসরে ও মাটির কোলয়েড ভাগে শোষিত হয়। শতকরা যে পরিমাণ জল মৃত্তিকা এইভাবে ধারণ করিতে সক্ষম হয়, ঐ মৃত্তিকার ততোটাই জল ধারণ ক্ষমতা। মৃত্তিকার ভৌত ধর্ম অর্থাৎ গঠন ও গ্রথণের উপর রন্ধ্রপরিসর স্থূল কিংবা সূক্ষ সঠিক করা হয়। যেমন বালি ও দোঁ-আশ মাটিতে ৩৫ থেকে ৫০ ভাগ কম রন্ধ্রপরিসর থাকে। আবার ৪০ থেকে ৬০ ভাগ বেশী রন্ধ্রপরিসর থাকে এঁটেল, দোঁয়াস ও ভারী মাটিতে অর্থাৎ বালি মাটিতে স্থূল রন্ধ্রপরিসর বেশী থাকে সেই কারণে সহজে বায়ু ও জল চলাচল করিতে পারে, আবার এঁটেল মাটিতে সূক্ষ রন্ধ্রপরিসর বেশী থাকে সেই কারণে জল বায়ু সহজে গমনাগমন করিতে পারেনা। মৃত্তিকার গঠন ও গ্রথণ ভাল হইলে মাটিতে বায়ু ও জল চলাচল সহজ হয় এবং উদ্ভিদ খাদ্যোপাদান অধিকমাত্রায় উদ্ভিদমূলের সংস্পর্কে আসে ফলে উহা সহজেই শোষিত হইয়া উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধি সাধন করে।

মৃত্তিকাস্থ বায়ুতে অক্সিজেন কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়াও নাইট্রোজেন ও জলীয় বাষ্প এবং অন্যান্য উপাদান রহিয়াছে। মৃত্তিকাস্থ কার্বন-ডাই-অক্সাইড জলের সহিত রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কার্বোনিক অম্লে পরিণত হয় এবং বিশুদ্ধ জলে অদ্রবনীয় কিছু উদ্ভিদ খাদ্যোপাদনকে দ্রবীভূত করে।

উদ্ভিদ্ মূলরোম মৃত্তিকাস্থ মুক্ত জল হইতে শ্বাসকার্য্য চালাইতে পারেনা কেননা উহাতে অক্সিজেনের অভাব থাকে। শোষিত জল হইতেও উদ্ভিদ মূলরোম শোষণ করিতে পারেনা কারণ ঐ জল মৃত্তিকা কণার সহিত দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া থাকে। উদ্ভিদ মূলরোম কেবলমাত্র মৃত্তিকাস্থ কৈশিক জলই সহজভাবে শোষণ করিতে পারে কেননা কৈশিক জল গতিশীল এবং মৃত্তিকাস্থ রাসায়ণিক, জৈবিক ও প্রাকৃতিক বিক্রিয়া জনিত উদ্ভিদ খাদ্যোপাদান গ্রহণযোগ্য অবস্থায় রূপান্তরিত করে।

উদ্ভিদের মূলরোমগুলি মৃত্তিকাস্থ জল ও খণিজদ্রবণ এন্দ্রস্মোসিস্ প্রক্রিয়ার দ্বারা শোষণ করিবার পর উহা অস্মোসিস্ প্রক্রিয়ায় মূলের কর্টেক্সের কোষ থেকে কোষান্তরে ধাবিত হইয়া জাইলেম নালিকার গাত্রকোষে আসে এবং মূলজ প্রেস উহা জাইলেম নালিকার মধ্যে আনয়ন করে। বাস্প-মোচনের ফলে জাইলেম নালিকার জল ট্রাকীডের ভিতর দিয়া উৎস্রোত হয় এবং পত্রশিরায় সঞ্চালিত হয়। পত্ররন্ধ্রের রক্ষীকোষের নীচে যে বাতাবকাশ আছে, সেখানে যে চাপ সৃষ্টি হয় তাহা অস্মোটিক্ চাপ অপেক্ষা বেশী থাকার ফলে

বাষ্পমোচন ঘটে এবং অতিরিক্ত জল বাষ্পাকারে বায়ুমন্ডলে মিশিয়া যায়। তাপ মাত্রা বেশী হইলে বাষ্পমোচন বেশী হয় ফলে জাইলেম নালীকায় উৎস্রোত বন্ধ হইয়া যায় কেননা মূলরোমে অস্‌মোসিস্‌ প্রক্রিয়া তখন কাজ করিতে পারেনা। অতিরিক্ত সূর্য্যালোকে পত্রস্থ ক্লোরোফিল নিস্ক্রিয় হইয়া পড়ে ফলে সালোক-সংশ্লেষণে ব্যঘাত ঘটে কেননা সালোক সংশ্লেষণে ক্লোরোফিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আভ্যন্তরীন সর্ত এবং ইহা জলকে বিশ্লিষ্ট করে। বাষ্পমোচনের জন্য প্রয়োজন আলোক, বায়ুর উষ্ণতা, চাপ, বায়ুর প্রবাহ এবং বায়ুর আদ্রতা। বাষ্পমোচন পরোক্ষভাবে মৃত্তিকার উত্তাপের উপরও নির্ভরশীল।



মূলজ প্রেস

সালোক সংশ্লেষণে সূর্য্যালোক শুধু দীপন মাত্রই নয় সূর্যালোকের বিভিন্ন রঙের মধ্যে লাল ও হরিদ্রাভ রঙের বিশেষ প্রভাব আছে। সূর্যালোকের উপস্থিতিতে পত্রের ক্লোরোফিলের সাহায্যে বায়ু হইতে গৃহীত কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও মাটি হইতে শোষিত জলকে এক জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শর্করা জাতীয় খাদ্যে পরিণত করে। এই সংশ্লেষিত খাদ্য উদ্ভিদ প্রোটোপ্লাজমে আত্তীকরণ ঘটে। এই প্রক্রিয়ায় রাসায়ণিক বিক্রিয়ার ফলে অক্সিজেন

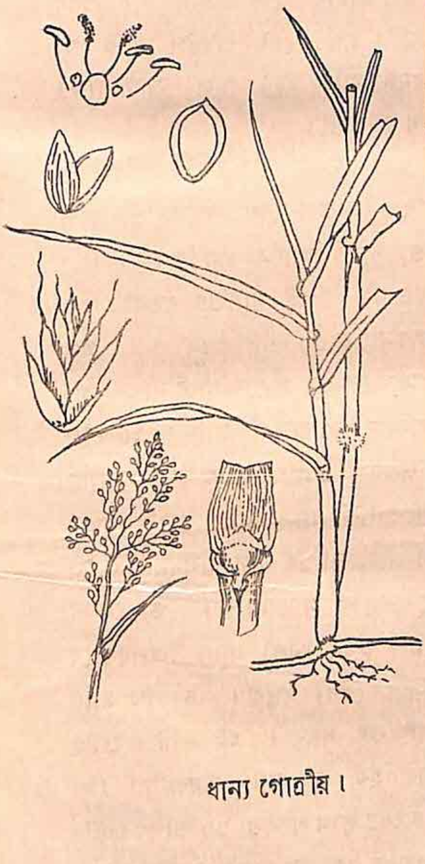
গ্যাস ও জল উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদ শ্বাসকার্য্যের জন্য এই অক্সিজেনের প্রয়োজনীয় অংশও ব্যবহার করে।

উদ্ভিদ শ্বাসক্রিয়ার সাহায্যে অক্সিজেন দ্বারা কোষ মধ্যস্থ শর্করা ও অন্যান্য খাদ্যের মধ্যস্থিত স্থৈতিক শক্তিকে গতিশক্তিকে পরিণত করে। রাসায়ণিক প্রক্রিয়া ও দহনের ফলে খাদ্যের অন্তর্গত শক্তি নির্গত হয়। সাধারণত ২০°—২৫° সেঃ তাপমাত্রার মধ্যে শ্বাসকার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। উদ্ভিদকোষে উৎসেচক শ্বাসকার্য্যের রাসায়ণিক বিক্রিয়াতে এক বিশেষ অংশ গ্রহণ করে। উৎসেচক প্রোটিন জাতীয়। উৎসেচক নিয়ন্ত্রিত বিক্রিয়া-উষ্ণতা ও প্রোটোপ্লাজমের অম্লতার উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ ২০°—৪০° সেঃ উষ্ণতায় উৎসেচক বেশী সক্রিয় থাকে। উদ্ভিদমূল মাটি হইতে সংগৃহীত নাইট্রেট সংবহন কলার মধ্য দিয়া বর্ধমান অঞ্চলে পেঁছায় এবং উৎসেচকের সাহায্যে নাইট্রেট অ্যামোনিয়াতে বিজারিত হয়। শ্বসনের ফলে উহা অ্যামিনো এ্যাসিডে পরিণত হয় এবং উহা হইতে এক জটিল বিক্রিয়ার মধ্য দিয়া প্রোটিন সংশ্লেষিত হয় ও সরাসরি প্রোটোপ্লাজম গঠন করে। ইহা গাছের বৃদ্ধি সাধন ঘটায়, ফুল ফোটায়, ফল ধরে অর্থাৎ সমস্ত কাজ কর্মেরই শক্তি জোগায়, পুষ্টি, বৃদ্ধি, চলন, গমন, ইত্যাদি যাবতীয় বিপাকীয় ও শরীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপ সাধন করে।

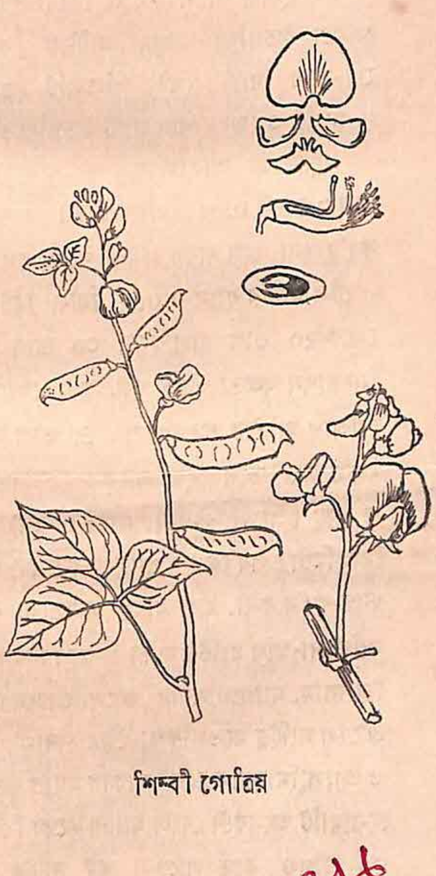
উদ্ভিদের শারীরবৃত্তীয় কারণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় আবশ্যিক জল, বায়ু, তাপমাত্রা, আলোকের প্রভাব ও মৃত্তিকাস্থ খাদ্যোপদান।

শ্রেণীবিন্যাসে শারীর বৃত্তীয় কারণে ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভানুযায়ী শিম্বী জাতীয় ঘাসের শিকড়ে আবহাওয়া হইতে সংগৃহীত নাইট্রোজেনের প্রায় এক তৃতীয়াংশ মাটিতে সঞ্চিত করে যাহা পরবর্তী ফসলের ফলন ভালোভাবে প্রভাবিত করে এবং এই কারনে কৃষিতে শিম্বী জাতীয় ঘাসের খুবই চাহিদা। শিম্বীজাতীয় ঘাস উৎপাদনে যদিও ধান্য জাতীয় ঘাসের তুলনায় অধিক জলের প্রয়োজন হয় তথাপি গবাদি পশু পালনে ও মৃত্তিকা উন্নতকরণ কল্পে কৃষিতে ইহার গুরুত্ব অপরিসীম। এই শিম্বী জাতীয় ঘাসে তুলনামূলকভাবে শতকরা বেশী ভাগ আমীষ জাতীয় উপাদান থাকায় (প্রোটিন) পশুখাদ্যে ইহার চাহিদা সব্বর্ত্মিক। সাধারণতঃ শিম্বী জাতীয় ঘাস বীরুৎ উদ্ভিদ জাতীয় ও সাধারণতঃ যুক্ত মূল, যৌগপত্র, একান্তর ও সোপপত্রিক। পুষ্প রেসীম ও বিন্যাসযুক্ত। উভলিঙ্গ ও অসমাঙ্গ এবং সামান্য গর্ভকটি ; পুষ্প প্রজাপতিসম। বিষম পাপড়িটি সর্ববাহিস্থঃ এবং সর্বাপেক্ষা বড় ও ধ্বজক পুষ্পপত্র বিন্যাসযুক্ত। বারসীম। লুসার্ন, মুগ, মটর, ছোলা বরবটি

ইত্যাদি ঘাস এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ধান্য গোত্রীয় ঘাস বর্ষজীবি বিরুৎ উদ্ভিদ। গোলাকার, সুস্পষ্ট পর্বযুক্ত এবং পর্বমধ্যগুলি ফাঁপা কান্ড। পত্র একক, একান্তর ও দ্বিসারী বিন্যাস। পত্রমূল আবরণযুক্ত, ইহা কান্ডকে বেষ্টন করিয়া রাখে। ফলকের বিপরীত দিক বিদীর্ণ থাকে। ফলক এবং আবরণের সংযোগস্থলে লিগিউল নামক একপ্রকার অঙ্গ থাকে। পুষ্প রঙিণ অথবা গন্ধযুক্ত হয়না। কীট-পতঙ্গ দ্বারা নহে কিন্তু বায়ু দ্বারা গর্ভ-সঞ্চার হয়। ভুট্টা, জোয়ার, টিওসীনটি, ওটস্ ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।



ধান্য গোত্রীয়।



শিম্বী গোত্রিয়

মৃত্তিকা ও মৃত্তিকাস্থ নাইট্রোজেন ফসফরাস ও পটাশের ভূমিকা

মাটির রাসায়নিক বৈশিষ্ট, ভৌতধর্ম ও জল ধারনের ক্ষমতা বিচার করিয়া বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়। মত্তিকার আকার ও গ্রথন, মৃত্তিকার গঠন, মৃত্তিকাস্থ রন্ধ্র পরিসর স্থূল কিংবা সূক্ষ, এবং তাহার মধ্যে জল ও রায়ু ধারণ ক্ষমতা ইত্যাদির উপর মাটিকে (ক) বালি মাটি (খ) এঁটেল মাটি (গ) দোঁ-আঁশ মাটি (ঘ) পলিমাটি (ঙ) নোনামাটি (চ) লাল মাটি (ছ) চুনামাটি ও (জ) পচা মাটি ইত্যাদিতে ভাগ করা হয়।

মৃত্তিকার আকার ও গ্রথন অনুযায়ী এবং গঠনানযায়ী (ক) বালিমাটির ব্যাস ২ থেকে ০.০২ মিলিমিটার। শতকরা ৮০ ভাগের বেশী বালি, ১০ ভাগ কর্দম কনা, জল ধারণ ক্ষমতা খুবই কম কিন্তু বায়ু চলাচল পর্যাপ্ত হর। (খ) এঁটেল মাটির ব্যাস ০.০০২ মিলি মিটারেরও কম। এই মাটিতে শতকরা ১০ থেকে ২০ ভাগ বালুকনা, ৩০ ভাগ পলিকনা ও ৫০ ভাগ কদর্ম কনা। জল নিস্কাশন ক্ষমতা খুবই কম, এবং বেশী বায়ু চলাচল করতে পারে না। (গ) দোঁআশ মাটিতে শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ বালি কনা, ৪০ ভাগ পলিকনা, ১৫ ভাগ কর্দম ও ৫ ভাগ চুন থাকে। জলধারণ ক্ষমতা, জলশোষন ক্ষমতা, সংযুক্তি ও বায়ু চলাচল ক্ষমতা আছে। (ঘ) পলিমাটির ব্যাস ০'০২ থেকে ০.০০২ মিলিমিটার পর্যন্ত। প্রায় শতকরা ৫৫ ভাগ বালিকনা ১৫ ভাগ পলিমাটি ও ৩০ ভাগ কর্দম কনা, জল ধারণ ক্ষমতা ও বায়ু চলাচল মাঝামাঝি। (ঙ) নোনা মাটি দো-আঁশ মাটির মতো কিন্তু বিভিন্ন খনিজ লবণ বেশী থাকে বিশেষভাবে জিপসাম, ম্যাগনেসিয়াম ও সোডিয়ামের পরিমান বেশী থাকে। (চ) লাল মাটি এঁটেল মাটির মতো কিন্তু জৈব পদার্থ খুবই কম থাকে। এই মাটিতে লোহ ও অ্যালুমিনিয়াম বেশী থাকায় ইহার রঙ লাল হয়, এই মাটি অম্লধর্মী। (ছ) চুনামাটি অনেকটা বেলে মাটির মতো কিন্তু চুনের ভাগ শতকরা ১০ ভাগও থেকে ৪০ ভাগও হতে পারে। এই মাটির জলধারণ ক্ষমতা বেশী ও ইহা ক্ষার

ধর্ম্মী। (জ) পচামাটি বালি মাটি, এঁটেল মাটি গলিত ও পচনশীল উদ্ভিদ, প্রানীর গলিত দেহ, কেঁচো, নাইট্রিকাংই জীবানু, চুন, নাইট্রোজেন ঘটিত যৌগ ইত্যাদি বিভিন্ন অনুপাতে থাকিয়া নানা ধরণের পচামাটি সৃষ্টি করে। জল ধারনের ক্ষমতা বেশী ও সাধারনত অম্লধর্ম্মী।

বালিমাটিতে পটল, শশা, তরমুজ কুমড়ো জাতীয় চাষ ভাল হয়। এঁটেল মাটিতে আম কাঁঠালের বাগান ভাল হয়, প্যারা ও নেপিয়ার ঘাস ভাল জন্মায়। দো-আঁশ মাটিতে ধান, গম, পাট, ভুট্টা, জোয়ার, টিওসীনটি, বরবটি, ফ্যামুলাম, বারসীম, লুসার্ন, ওটস্ ইত্যাদি প্রায় সব ফসলেরই চাষ চলে। পলিমাটিতে প্রায় সব রবিশষ্যই ভাল জন্মায়। নোনা মাটিতে সাধারণত কোন ফসল জন্মায় না তবে নারিকেল সুপারি ও অন্যান্ন লবনাম্বু গাছ যেমন সুঁদারি, গরান ইত্যাদি জন্মায়। লাল মাটিতে অন্যান্ন ফসলের সহিত ধানের চাষও হয়। চুনা মাটিতে ভাল কমলালেবুর বাগান হয়।

মাটির উৎপাদনের ক্ষমতাকেই মাটির উর্ব্বরাশক্তি বলা হয়। মাটির উর্ব্বরাশক্তি ও গুনাগুন নির্ভর করে মৃত্তিকাস্থ নাইট্রোজেন ফসফরাস, পটাশ ও অন্যান্ন খনিজ লবণ, জৈব পদার্থের পরিমান, মৃত্তিকার কনার আকার, অম্লত্ব, জল, ক্ষারত্ব, অক্সিজেন, কার্বন-ডাইঅক্সসাইড এবং মাটির তাপমাত্রা ইত্যাদির উপর।

উদ্ভিদ মৃত্তিকাস্থ সমস্ত মৌলের মধ্যে ফসফরাস নাইট্রোজেন ও পটাশিয়াম অধিক পরিমানে গ্রহণ করে, ফলে মাটিতে ইহার পরিমান হ্রাস পায়। এই জন্য ফসলের পুষ্টির জন্য চাষের জমিতে নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাশের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য। নাইট্রোজেন, প্রোটিন, ক্লোরোফিল ও প্রোটোপ্লাজমের উপাদান ফসলের বৃদ্ধির জন্য বিশেষ করিয়া পত্রের বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য্য। শর্করা জাতীয় খাদ্যের রূপান্তরের জন্য ফসফরাসের যেমন প্রয়োজন, স্নেহজাতীয় দ্রব্যের আত্তীকরনের জন্যও ইহা একান্ত প্রয়োজন, আবার পটাশ জাতীয় উৎপাদনকে মাটি হইতে গ্রহণ করিবার জন্যও ফসরাসের প্রয়োজন। পটাশের উপর উদ্ভিদের শ্বাসক্রিয়া ও বাস্পোমোচন অনেকটা নির্ভরশীল। প্রোটিন ও স্নেহজাতীয় পদার্থ সংশ্লেষনের জন্যও পটাশের প্রয়োজন। পটাশ ক্লোরোফিল গঠনের জন্যও আবশ্যক।

মৃত্তিকাতে কখনও কখনও নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ সরবরাহ অজৈব বা রাসায়নিক সার প্রয়োগ করিয়া, এবং জৈব সার প্রয়োগ করিয়া হয়। অজৈব বা রাসায়নিক সারে খাদ্যপাদান বেশী থাকে ও সহজে গ্রহণযোগ্য অবস্থায়

থাকে বলিয়া ফসল উহা সহজেই নিঃশেষ করিতে পারে কিন্তু মাটির ভৌত ধর্মের কোন পরিবর্তন করে না। জৈব সার মাটির ভোত ধর্মের উন্নতি ঘটায়। জৈব সার সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ভিদের গ্রহণ যোগ্য হয়না কারণ নাইট্রোজেন ফসফরাস ও পটাশ সার একত্র অবস্থায় থাকে এবং খাদ্যোপাদান অজৈব সারের তুলনায় কম থাকে।

অজৈব সার এ্যাসোনিয়াম সালফেটে নাইট্রোজেন থাকে শতকরা ২০.৬ ভাগ, এ্যামোনিয়াম সালফেট নাইট্রেটে থাকে ২৬.০ ভাগ, ইউরিয়ায় থাকে ৪৬.০ ভাগ, এ্যমোনিয়াম নাইট্রেটে থাকে ৩৫.০ ভাগ এবং সোডিয়াম নাইট্রেটে থাকে ১৫,৬ ভাগ। জৈব সার গোবরে আছে ০.৫—১.৫, কম্পোস্টে আছে ১.৫—২.০, সবুজ সারে আছে ০.৫—০.৭, খইলে থাকে ৪.০—৭.০ পর্যন্ত। অবশ্য জৈব সারে ঐ সঙ্গে ফসফরাস ও পটাশ রহিয়াছে। গোবর সারে ফসফরাস রহিয়াছে ০.৪-০.৮, কম্পোষ্টে—১.০, সবুজসারে ০.১—০২, খইলে আছে ১-৫—২.০ পর্য্যন্ত। এ ছাড়াও পটাশ রহিয়াছে গোবর সারে ০.৫—১.৫, কম্পোষ্টে ১.৫, সবুজ সারে ০.৬—০ ৮ এবং খৈলে আছে ১.২ ভাগ পর্য্যন্ত। ইহা ছাড়াও জৈব সারে চুন, ম্যাগনেশিয়াম, লৌহ, তামা গন্ধক প্রভৃতি উপাদানগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে আছে। অজৈব বা রাসায়নিক সার মিউরেট অফ্ পটাশে আছে ৪৬.৭ থেকে ৬২ ভাগ, সালফেট অফ্ পটাশে আছে ৪৬.০ থেকে ৫২—০ ভাগ পর্য্যন্ত পটাশ। ফসফরাসের জন্য অজৈব বা রাসায়নিক সার সুপার ফসফেট, এতে আছে ১৬.০ থেকে ২০.০ ভাগ, ডবল ও ট্রিপলে থাকে যথাক্রমে ৩০.০—৩৫.০ ও ৪৫.০——৫০.০ ভাগ।

গবাদি গৃহপালিত পশু ও পাখী হইতে আমরা যে পরিমান দেহজাত সার পাই সাংবাৎসারিক—প্রাতটি গরু ভেড়া, শুকর ও মুরগীর মলমুত্রের হিসাবনুসারে প্রতিটি গাভী প্রতিদিন মলত্যাগ করে প্রায় ২৫ কিলো, মুত্র ত্যাগ করে প্রায় ১০ কিলো সুতরাং এক বছরে মলমুত্র ত্যাগ করে প্রায় ১২ টন বা তারও বেশী। একটা ভেড়া প্রতিদিন মল ত্যাগ করে প্রায় ১০ কিলো বা তারও বেশী, মুত্র ত্যাগ করে প্রায় ৫ কিলো সুতরাং সাংসারিক হিসাবে দেখা যায় প্রায় ৬ টন। একটি শুকর দৈনিক মলত্যাগ করে প্রায় ২০ কিলো, মুত্র ত্যাগ করে প্রায় ১৬ কিলো বা তারও বেশী। সুতরাং সাংবাৎসারিক হিসাবে দাঁড়ায় প্রায় ১৫ টন। প্রতি টন এমন জৈবসারে থাকে নাইট্রোজেন ৫ কিলো এবং ফসফরাস অম্ল থাকে প্রায় ৩ কিলো। গাভীর মলে থাকে ০.৫০%নাইট্রোজেন, ভেড়ার মলে থাকে ০.৭৫%, শুকরের মলে ০.৫৫%,। মুত্রে থাকে—গাভীর ১.০০%ভেড়ার ১.৩৫%

ও শূকরের ০.৪০%। ফসফরাস গাভীর মলে থাকে ০.২০%, ভেড়ার ০.৫০% শূকরের ০.৫০%। মূত্রে থাকে—গাভীর খুবই অল্প, ভেড়ার ০.০৫% শূকরের ০'১০%। পটাশ থাকে—গাভীর মলে ১'১০%, ভেড়ার—০'৪৫%, শূকরের ০'৫০%। গাভীর মলমূত্রে আছে ০'৬০% নাইট্রোজেন, ০.১৫%১৫% ফসফরাস, ও ০'৪৫% পটাশ। ভেড়ার আছে ০'৯৫% নাইট্রোজেন, ০'৩৫% ফসফরাস, ও ১'০০%পটাশ। শূকরের আছে ০'৫০% নাইট্রোজেন, ০'৩৫% ফসফরাস ও ০'৫০% পটাশ।

গৃহপালিত পশুপাখীর দেহজাত মলমূত্র সার হিসাবে জমিতে সঠিকভাবে ব্যবহার করিলে, অজৈব সার খরিদ করিবার জন্য একটি বিরাট অংক বাঁচানো সম্ভব এবং মৃত্তিকার ভৌত ধর্মের উন্নতি করা সম্ভব। উপরের হিসাব হইতে দেখা যায়, যে পরিমাণ জমিতে ১ কুইন্টাল এ্যামোনিয়াম সালফেট প্রয়োগ করা প্রয়োজন হয়, ঐ পরিমাণ জমিতে ৪ টন গোবর সার দিলে একই পরিমাণের নাইট্রোজেন জমিতে প্রয়োগ করা হইল। ইহা ছাড়াও জৈব সারে পরিমিত ফসফরাস ও পটাশ যুক্ত আছে তাহা ছাড়াও আছে চুন, লৌহ, ম্যাগনেশিয়াম ইত্যাদি।

জৈব সার সব রকম জমিতে প্রয়োগ করা চলে। কারণ উহা জমির উর্বরতা সংরক্ষণে সাহায্য করে। মৃত্তিকায় জৈবিক ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি করে এবং উদ্ভিদ হরমোনে বৃদ্ধি ঘটায়। নাইট্রিকরণ, এ্যামোনিয়াকরণ ও নাইট্রোজেন বন্ধন ক্রিয়া দ্রুততর করে। মৃত্তিকায় উদ্ভিদ বৃদ্ধিকারক হরমোন অক্সিজেন 'এ' এবং 'বি', হেটেরো অক্সিন ও ভিটামিন প্রস্তুত করে।

অজৈব সার প্রয়োগ করিবার আগে জানা থাকা দরকার মাটির অম্লত্ব অথবা ক্ষারযুক্ত অবস্থা। মাটির অম্লত্ব বেশী থাকলে চুন ও জৈব পদার্থ প্রয়োগ করা উচিত আর ক্ষারত্ব থাকলে গন্ধক প্রয়োগ করা উচিত। মাটিতে কোন খাদ্যোপাদানের (নাইট্রোজেন, ফসফরাশ ও পটাশ) কত ঘাটতি আছে এবং কোন ফসলের জন্য কোন অজৈব সার প্রয়োগ করা দরকার এবং উহা কত পরিমাণে ইত্যাদি স্থিরীকরণ দরকার হয়।

বাংলায় সহজে উৎপন্ন পশুখাদ্য ঘাসের পরিচিতি

ক্রমিক নং	ঘাসের নাম	বোটানিকাল নাম	উপযোগী ভ্যারাইটি
১.	জোয়ার ঘাস	সরগম ভালগারি	কে-২, কে-৩ জে,এস-২৬৩, ২৯/১ ৭৩/৫৩, উজ্জইন-৬, ৮, বিদীশা-৬০/১, ও এম-পি-চেরী।
২.	ভুট্টা	জিয়া মেইজ	গঙ্গা-৩, ৫, ১০১, কালিম্পং, ডেকান, জয়া (কম্পজিট) বিজয়, বিক্রম, কৃষাণ, এন-পি-২, কে-১৪৭, জোনপুরি, রনজিত (হাইব্রীড)।
৩.	টিওসিনটি	ইউক্লিনা মেক্সিকানা	
৪.	মটর	পিসাম স্যাটিভাম	কমন
৫.	বরবটি	ভিগনা সিনেনসিস্	ই-সি-৪২১৬, H, G-5, এফ ও এস্-১ এফ ও এস্-১০, কে-৩৯৭ রাশিয়ান জায়ন্ট, আর-এফ্, এস-এম্-১৪৬।
৬.	(রাইসবিন্)—গাইমুগ	ফ্যাসুলাম ক্যালকারেটস	কে-১
৭.	(টেট্রাবংলাই)—বিশালমুগ	ফ্যাসুলাস অরিয়াস-টেট্রাপ্লয়েড	কমন

ক্রমিক নং	বোটানিকাল নাম	উপযোগী ভ্যারাইটি
৮. বারসীম্	ট্রির্ফলিয়াম আলেকজান্দ্রিয়াম	মেচকার খাদরবি
৯. লুসার্ন	মেডিকাগো স্যাটিভা	শীরষা-৯, মোঁপা, আর্ফরিকান— আনন্দ— এন-ডি-আর-আই—সিলেকশন
১০. ওটস	এ্যাভেনা-স্যাটিভা	কেন্ট, শীরষা, আলজেরিয়ান।
১১. হাইব্রিড নেপিয়ার	পেনিসেটাম পারপিউরিয়ার সঙ্গে শংকর পেনিসেটাম টাইফয়েডমের।	পুসাজয়েন্ট, এন-বি-২১, ই-বি-৪,
১২. প্যারাঘাস	ব্রাসিয়ারিয়া মিউটিকা	কমন।)

হাইব্রীড নেপিয়ার—১

নেপিয়ার ঘাস বারোমেসে ঘাস, জন্মানোও সহজ। একবার বসালে সারা বছর ধরে থাকবে এবং তারও বেশী এমনকি যথারীতি যত্ন রাখিলে দুই তিন বৎসরও ফলনশীল অবস্থায় থাকে। ইহাতে প্রচুর পরিমাণে ক্যারোটিন থাকায় পশুদেহে ভিটামিন 'এ' প্রস্তুত হয়। ইহা কোষ্ঠ পরিস্কার করে। নেপিয়ার ঘাস সমান্তরাল শিরাযুক্ত সরু লম্বা পাতার ঘাস। এক একটি পাতা লম্বায় ১—১½ মিটার পর্যন্ত হইতে পারে কিংবা তারও বেশী। আর একটি বসানো কাটিংস থেকে এক একটি ঝাড় উৎপন্ন হয়, ফলে ফলনেরও প্রাচুর্য্যতা থাকে। এক বছর সময়ের মধ্যে ৪/৫ বার কাটিয়া ফলন নেওয়া যাইতে পারে। আপদ্‌কালিন ঘাস হিসাবে মানে যখন অন্য চাষের ঘাস এর যোগান থাকে না সেই সময়ে এই ঘাস খুবই প্রয়োজন মিটায়। শুধু শীতের সময়েই এর ফলন নেওয়া যায় না। এই ঘাসের আর একটি সুবিধা হইল, পুকুরের পাড় বা অন্যান্ন উঁচু অনাবাদি জমিতে ইহা লাগান যায়, যেখান হইতে অন্য ফসল নেওয়া সম্ভব হয় না। সাধারণ নেপিয়ার ঘাসের সহিত বাজরার শংকর ঘটাইয়া এই হাইব্রীড নেপিয়ার ঘাস সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহা জন্মানো সহজ এবং একবার জন্মানো হইলে ইহা মরে না, যদিনা গাছের গোড়ায় জল দাঁড়াইয়া থাকে বা খুব বেশী খরায় পড়িয়া না থাকে। একটু সাধারণ যত্ন নিলেই ভালো ফলন পাওয়া যায়।

কখন লাগাইতে হয়—একমাত্র শীতের সময় ছাড়া বছরের যে কোনও সময় নেপিয়ার ঘাস লাগানো যাইতে পারে অবশ্য যদি সেচের জল পাওয়া যায়। মার্চ এপ্রিলের বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করিয়া লাগাইলে, প্রথম বৃষ্টির পর হইতেই লাগানো যাইতে পারে, তবে নজর রাখিতে হইবে কাটিং বসাইবার পর পরই যেন একটি বৃষ্টি পাইয়া যায়। যদি এক সপ্তাহের বেশী সময়ের মধ্যে বৃষ্টি না পায় আর জমিতেও তেমন যোঁ না থাকে তবে একটি হালকা সেচ দিয়া দিলে খুবই তাড়াতড়ি চারা বাহির হইয়া আসিবে।

কি করিয়া জমি তৈরী করিতে হয়—অন্তত পাঁচ ছয়বার লাঙগল ও মই দিয়া জমি ভালোভাবে তৈরী করিয়া নিতে হয়। জমি তৈরী করার সময়ই বিঘা প্রতি ৩০—৩৫ কুইন্টাল গোবর সার দিয়া, জমিতে ভালোভাবে মিশাইয়া দিতে হয়। উঁচু জমির দোঁ-আশ মাটিই এই ঘাস চাষের উপযোগী। যদি কোন ছোট জমিতে বা গোয়াল ঘরের সংলগ্ন জমিটুকুতে অথবা পুকুড়পার বা নালার ধার হয় তবে তেমন জায়গায় কোঁদাল চালাইয়া জমি তৈরী করিয়া লইতে হয় কেননা লাঙগল দিয়া চাষ তেমন সব ছোট জমিতে সম্ভব নয়। গোয়ালঘরের সংলগ্ন এলাকা যতোই ছোট হোক না কেন, এই ঘাসের কাটিংস বা মুলগুচ্ছ বসাইবার ভালো জায়গা কেননা গোয়াল ধোয়া জল, গোবর সার সব সময়ে পাইয়া থাকে, ফলে অধিক ফলন পাওয়া যায় এবং যেহেতু একবার উৎপন্ন করা ফসল দুই বছর বা তারও অধিক কাল পর্যন্ত চলে, সেই কারণে চাষী ভাইরা বা গোপালকেরা অর্থকরী ফলনশীল জমিতে এই ঘাস বসাইতে বেশী আগ্রহী হননা, সুতরাং অব্যবহার্য ছোট জায়গায় এই নেপিয়ার ঘাস বসাইতে চাহেন।

কি করিয়া লাগাইতে হয়—আখের মতো এই ঘাসের কান্ড কাটিয়া চাষ করিতে হয়। গাঁট হইতে বাহির করা বায়ুবীয় মূল হইতেই বংশ বিস্তার ঘটে। এই ঘাসের কান্ড দেখিতে অনেকটা আখের মতোন কিন্তু আঙগুলের চাইতেও মোটা। কান্ড হইতে দুই তিনটা গাঁট রাখিয়া কাটিয়া আলাদা করিয়া লইতে হয়। ডগার নরম অংশ ও পাতা বাদ দিয়া দিন, এবং গোড়ার দিককার শক্ত অংশ হইতে এক একখানা কাটিংস লম্বায় ১০—১২ ইঞ্চি করিয়া দাঁড়াইবে এমনভাবে কাটিয়া নিন্। এক বছরের পুরানো গাছের কাটিং নেওয়া বেশী নির্ভরযোগ্য কেননা ওর গাঁট থেকে ছোট খাট শেকড় বার করে দিয়েছে বা শেকড় বেরোবার উপযুক্ত হয়ে আছে এমনধারার গাছের কাটিংস এর প্রায় প্রতিখানাই নির্ভরযোগ্যভাবে টিকিয়া যাইবে এবং চারা বাহির হইবে। এইবার এই কাটিংগুলি লাইন করিয়া ২৫—৩০ ইঞ্চি দূরে দূরে বসাইয়া যান। কাটিংগুলি লাইনে একটু হেলাইয়া বসাইবেন যেন প্রথম গাঁটটি মাটির তলায় থাকে এবং দ্বিতীয় গাঁটটি মাটি ছুঁইয়া থাকে। ইহা যেন ৪৫° কম কতনা হয় বা ৬০°র বেশী না হয়। কাটিংসগুলি হইতে চারা বের হওয়া পর্যন্ত উত্তাপ-জনিত শুস্কতা এড়াইবার জন্যই এই কাত করিয়া বসানো হয়। লাইন হইতে লাইনের ব্যবধানও ঐ একই ২৫—৩০ইঞ্চি (দেড় হাত) রাখুন। এইভাবে লাগাইলে বিঘা প্রতি কটিংস লাগিবে তিন থেকে চার হাজার। জমিতে যখন

খুব ভালো যোঁ থাকিবে তখনই কাটিংস বসাইবেন। যোঁ কম থাকিলে বসাবেন না, বসাইলে চারা বাহির হইতে খুবই দেরী হইবে বা উপযুক্ত যোঁ না পাওয়া পর্য্যন্ত চারা বাহির হইবে না। বসাবার তৃতীয় সপ্তাহে একবার সেচ দিয়া দিবেন যদি বৃষ্টি না পেয়ে মাটি খুবই শুকনো হইয়া যায়। ছয় সপ্তাহ বাদে লাইনের ভিতর হইতে দুইপাশে মাটি ধরাইয়া ভ্যালির মতোন করিয়া দিবেন যেমন আখের চাষে করা হইয়া থাকে। আবার ১ মিটার দূরে দূরেও লাইনের ব্যবধান করিতে পারেন এবং গাছে গাছে ব্যবধানও একটু বাড়াইয়া লইতে পারেন, ইহাতে মধ্যবর্তী জায়গা খানিকটা বাড়িবে আর এই মধ্যবর্তী জায়গায় বছরের বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ঘাসের চাষ তুলিয়া নিতে পারেন। যেমন খরিপে ফ্যাসুলাম জাতীয় ঘাস বা বরবটি, রবিতে বারসীম ঘাস ইত্যাদি। আপনি যদি ইচ্ছা করেন ঐ এক মিটার প্রশস্ত জায়গার ঠিক মাঝখানে বাঁধাকপির চাষ করিয়া নিতে পারেন। ঠিক মাঝখানে কপি চারা বসাইয়া দিলে দুপাশে দুহাত জমি পাচ্ছেন খালি অবস্থায়। কপির জন্য ঐ দুই পাশ থেকে মাটি ধরিয়ে আইল দিয়ে ভ্যালি তৈরী করিয়া নিতে পারা যায়। ঐ ভ্যালির মধ্য দিয়া কপির সেচের জল প্রবাহিত থাকিলে আপনার কপি যেমন সেচের সুযোগ পাচ্ছে, তেমন বিনা খরচে আপনার হাইব্রীড নেপিয়ার ঘাসও কয়েকবার সেচের সুযোগ নিতে পারে। ফলে আপনার নেপিয়ার ঘাসও শীতকালে সতেজ অবস্থায় থাকে এবং ফেব্রুয়ারী মাস থেকেই আপনি ফলন নিতে পারবেন। জমির যথোপযোগী ব্যবহার, অধিক ফলন ও ঘাসের মিশ্রভাব, খাদ্যের মূল্যমানের বৃদ্ধি ঘটায়। বারসীম সুলার্ণ ঘাস বুনলে মাটিতে যে পরিমাণ নাইট্রিকাংই ব্যাকটেরিয়া জন্মায় তাতে করে হাইব্রীড, নেপিয়ার ঘাসের অন্তবর্তী পরিচর্য্যাকালীন কোনও এ্যামোনিয়াম সালফেট বা ইউরিয়া ব্যবহার না করিলেও চলিতে পারে।

কি করিয়া ফলন নিতে হয়—বসাইবার তিন মাস পর হইতেই ফলন নিতে পারেন। মাটি হইতে ৬-৮ ইঞ্চি ছাড়িয়া দিয়া কাটিয়া নিতে হয়। কাটিয়া নিবার পর পরই বিঘা প্রতি ৮-১০ কেজি এ্যামোনিয়াম সালফেট ছড়াইয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে সেচ দিয়া দিবেন। ৬-৮ সপ্তাহ বাদে আবার ফলন নিবার উপযুক্ত হইবে তখন আবার ফলন নিন্। এইভাবে প্রতি কাটিংস্ নিবার পর সার ও সেচ দিয়া রাখিলে ফলন নিশ্চিত হইবে। যদি একটু স্যাঁতস্যাতে বা একটু

ভেজা জমিতে ফসল থাকে আর গোবর সার দিয়া রাখিতে পারেন তবে কাটিংস নিবার পর সার বা সেচ না হইলেও চলিতে পারে। দুই লাইনের মাঝখানে আগাছা জন্মাইতে দিবেন না। খরায় পড়িয়া মাটি শক্ত হইয়া গেলে, কোঁদালে মাটি আলগা করিয়া দিবেন ইহাতে আগাছা জন্মাইবেন না, খরাজনিত কষ্টও গাছগুলিকে তেমন পীড়িত করিতে পারিবেনা। শীতের সময় কোন ফলন পাবেন না কিন্তু সেচ দিয়া রাখিবেন, তাহা হইলে শীত শেষ হইয়া গেলেই আবার গাছ বাড়ন নেয় ও ফলন নিবার উপযোগী হয়। সারা বছর বিঘা প্রতি ফলন পাইবেন। ৪০-৫০ কুইন্টাল।

প্যারা ঘাস—২

প্যারা ঘাসের চাষ খুবই সহজ। গরম দেশে ভাল জন্মায়। অধিক আদ্রতা বিশিষ্ট আবহাওয়া এবং প্রায় সকল প্রকার মাটিতেই জন্মায়। এই ঘাস জলে দাঁড়াতে পারে এবং স্বভাবত ভিজা মাটিতেই ভাল জন্মায়। প্যারা ঘাস একবার বসাইলে সারা বছর নাগাত চলিতে থাকে। এই ঘাসের স্বভাব জমির উপর লতার মতো এগিয়ে চলা। দেখিতে আঙুলের চাইতেও সরু লতা, ডগার দিকে বেশ খানিকটা নরম ও লম্বা পাতা হয়। প্যারা ঘাস ১—১½ সেন্টিমিটার চওড়া, ১—১½ ফিট লম্বা পাতা বিশিষ্ট ঘাস এবং পাতার সংযুক্তি থেকেও অন্তত ১০।১২ ইঞ্চি কাণ্ড খুবই নরম থাকায় উহাও পাতার সহিত ঘাস হিসাবে ব্যবহার্য্য, ফলে প্যারা ঘাসেরও ২—২½ ফিট লম্বা ঘাস পাওয়া যায়। এই ঘাস জমিতে ক্রীপারের মতোন প্রতি গাঁট হইতে শিকড় বাহির করিয়া মাটি ধরিয়া নেয় ও বাড়িতে থাকে। সুতরাং এই ঘাস একবার কোন জমিতে জন্মাইলে তাহা নির্মূল করিয়া দিয়া ভিন্ন ফসলের জন্য জমি তৈরী করা খুবই শ্রম সাধ্য ও ব্যয় সাপেক্ষ। এই সঙ্গত কারণেই কোনও অর্থকরী ফলন শীল জমিতে এই ঘাস না লাগানোই উচিত। এই ঘাস বছরের সকল সময়েই ফলন দেয়। শীতের সময়টা ফলন কম থাকে। প্যারা ঘাস নিচু জলাজমিতে, এঁদো স্যাঁতস্যাঁতে জমিতে, নালার ধারে পুকুর পাড়ে গোয়াল ঘরের আনাচে কানাচে ও অনাবাদি পোড়ো জমিতে লাগানো যাইতে পারে। এই ঘাস গোয়াল ঘরের পিছনের দিক অথবা সংলগ্ন জায়গায়, যেখানে গোয়ালা ধোয়া জল নাবে, গোবর রাখা হয়, সেদিকেই বাছিয়া নেওয়া ভাল। এই ঘাসের জন্য ফলনশীল ভালো জমির প্রয়োজন হয় না। একটু সাধারণ যত্ন লইলেই ৪।৫ সপ্তাহ পর পরই ফলন পাওয়া যাইতে পারে।

কখন লাগাইতে হয়—বর্ষার সময়ই এই ঘাস লাগাইবার উপযুক্ত সময়। আষাঢ় মাস হইতে আরম্ভ করিয়া ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত এই ঘাস লাগানো চলিতে পারে। কারণ বর্ষার ভিজা মাটিতে এই ঘাস তাড়াতাড়ি বসিয়া যায় এবং বর্ষার



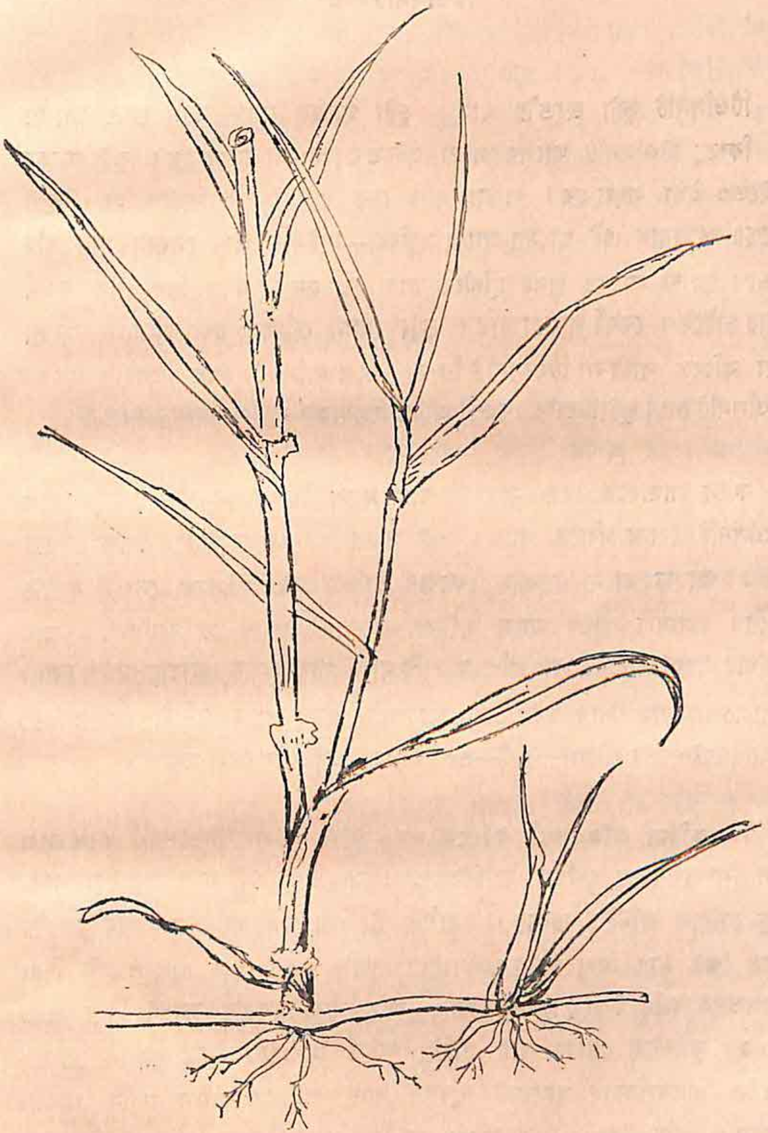
হাইব্রীড নেপিয়ার

আদ্র আবহাওয়া এই ঘাসকে তাড়াতাড়ি বাড়িয়া উঠিতে খুবই সাহায্য করে। যে সব অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের অনুপাত বেশী এবং বছরের কয়েক মাস মাটি ভিজা থাকে সেইখানে এই ঘাস জন্মানো খুব সহজ।

কি করিয়া জমি তৈরী করিতে হয়—ভারি বা হালকা প্রায় সব রকম মাটিতেই এই ঘাস উৎপাদন করা চলে। যেখানে লাঙ্গল চলিবে, জোঁ পেলেই ২/৩ বার চাষ দিয়া জমি তৈরী করিয়া নিন্। যেখানে লাঙ্গল চলিবে না সেখানে কোঁদাল চালাইয়া মাটির আঁটুনি ভাঙিয়া দিন। ডোবা বা নালার ধার এবং কাদা মাটি হইলে জমি তৈরীর তেমন প্রয়োজন নাই। নীচু এঁটেল বা দোঁয়াশ মাটি এই ঘাস জন্মানোর উপযোগী। জমি তৈরীর সময়ই বিঘা প্রতি ৩০/৩৫ কুইন্টাল গোবর সার দিয়া জমি তৈরী করিলে অধিক ফলন পাওয়া যায়।

কি করিয়া লাগাইতে হয়—আঙ্গুলের চাইতেও ইহার সরু সরু লতা হয় আর গাঁট হইতে শিকড় বাহির করিয়া মাটি ধরিয়া আগাইয়া চলে। এক একটি লতা এমনকি ৪-৬ ফিট্ পর্য্যন্ত লম্বা হয়। এই লতার ডগার নরম অংশ কাটিয়া বাদ দিয়া দিন এবং শক্ত অংশ হইতে তিনটা করিয়া গাঁট রাখিয়া ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া নিন। প্রতিখানি কাটিংস লম্বায় ৭-৯ ইঞ্চি দাঁড়াইবে। তৈরী জমিতে ছড়াইয়া দিয়া মই চাপা দিয়া বোনা যায় তবে লাইন করিয়া ৯—১২ ইঞ্চি অন্তর অন্তর লাগানোই ভাল। লাইনে লাইনেও ঐ একই ব্যবধান রাখিয়া কাটিংস বসাইতে হয়। কাটিংস এমনভাবে বসাইবেন যেন একটি গাঁট মাটির তলায় থাকে, দ্বিতীয় গাঁটটি মাটি ছুঁইয়া থাকে। একটু এলাইয়া বসাইবেন। বিঘা প্রতি ১২-১৪ হাজার কাটিংস লাগিবে—ওজন দাঁড়াইবে প্রায় ৭০-১০০ কে.জি। মাটি পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিজা থাকিলে এক সপ্তাহের মধ্যেই কাটিংস মাটি ধরিয়া নেয়। কাটিংস বসাইবার পর যদি বৃষ্টি না পায় বা জমির জোঁ কমিয়া যায় এবং খরায় পড়ার সম্ভাবনা দেখা যায় তবে সেচের জল দিয়া জমি ভিজাইয়া দেওয়া উচিত। ভিজা মাটিতে ভালো ফলন হয় বলিয়া নজর রাখা উচিত প্যারা ঘাসের জমি যেন শুকনো না হয়ে যায়।

কি করিয়া ফলন লইতে হয়—লাগাইবার ৩ মাস পরেই কাটিবার উপযুক্ত হয়। ডগ হইতে যতোটা নরম থাকে কাটিয়া নিন্। ফসল কাটিয়া লইবার



টিওসিনটি—৩

টিওসিনটি ভুট্টা জাতীয় ঘাস। ভুট্টা গাছের যেমন কোন ডালপালা হয় না কিন্তু টিওসিনটি ঘাসের গোড়া হইতে ডালপালা বাহির হয়। ভুট্টা গাছের চাইতেও ইহা লম্বা হয়। লম্বায় প্রায় দেড় দুই মিটার পর্য্যন্ত হয়। ভুট্টা গাছের তুলনায় এই ঘাসের আরো সুবিধা—দুইবার ফলন নেওয়া যায় যদি বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম বৃষ্টিতে চাষ করা হয়। ফলে বিঘা প্রতি ফলন ভুট্টার চাইতেও বেশী পাওয়া যায়। ভুট্টা যেমন জমিতে জল দাঁড়ানো অবস্থা সহ্য করিতে পারে না টিওসিনটি কিন্তু জলে খানিকটা সময় দাঁড়াইতে পারে। টিওসিনটি চাষে ভুট্টার চাইতে বেশী জলের প্রয়োজন।

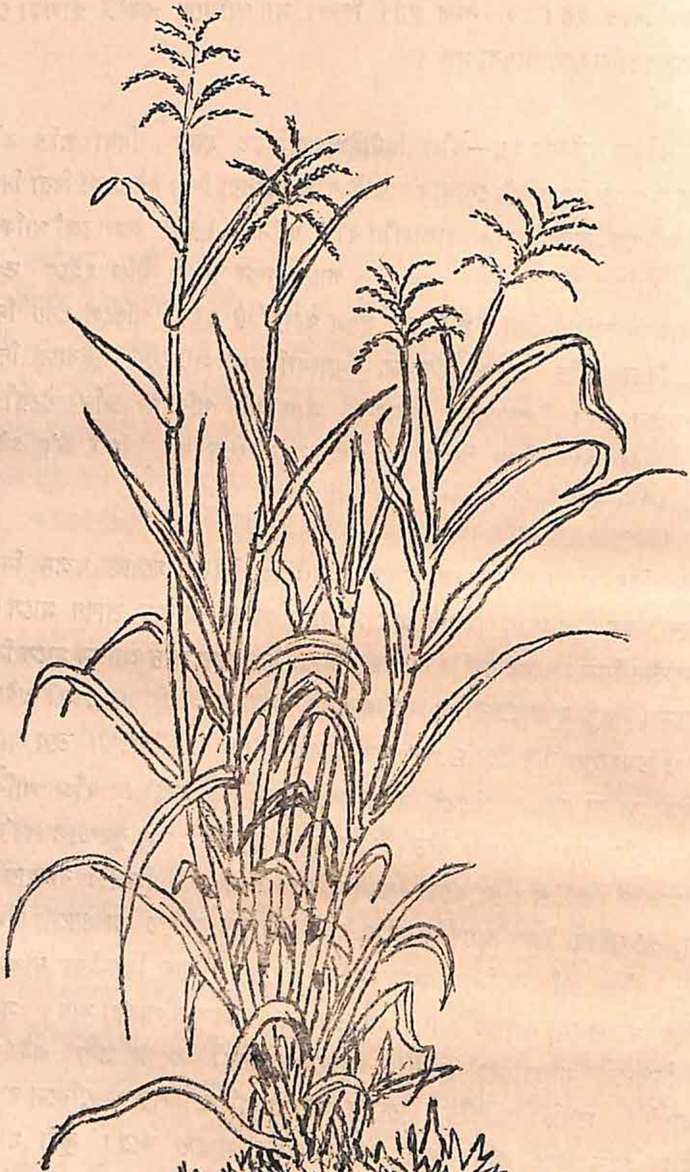
কখন লাগাইতে হয়—চৈত্র বৈশাখ মাসে প্রথম বৃষ্টি হইয়া গেলে টিওসিনটি বোনা চলিতে পারে। এই সময়ে বুনিলে দুইবার ফসল নেওয়া যায়। আষাঢ় মাসে একবার আবার আশ্বিন মাসেও ফসল নেওয়া যাইতে পারে। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে বুনিলে একবারই ফলন হয় আশ্বিনে। তবে দুইবার ফলন নিলে বিঘা প্রতি যতোটা ঘাস পাওয়া যায়, আষাঢ় মাসে বোনা ফসলের একবার ফলন প্রায় তার কাছাকাছি হয়। গরম ও আদ্র আবহাওয়া এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪০"—৫০" হইলেই এই ঘাস ভাল জন্মায়।

কি করিয়া জমি তৈরী করিতে হয়—ভুট্টার মতোন টিওসিনটি ঘাস ভাল জল নিষ্কাশনযুক্ত দোঁয়াশ মাটিতে ভাল জন্মায়। এই ঘাস লাগাইবার জন্য উঁচু দোঁয়াশ জমিই দরকার। মাটির উর্বরতা কম থাকিলে জমি তৈরীর সময় জৈব সার দিয়া তাহা পোষাইয়া লইতে হয়। চার চাষ ও মই দিয়া ভালভাবে জমি তৈরী করিতে হয়। জমি তৈরী করার সময়ই বিঘা প্রতি ২০-২৫ কুইন্টাল গোবর সার মাটির সহিত মিশাইয়া দিতে হয়। ১৮-২০ কে.জি. এ্যামোনিয়াম সালফেট দুবারে দিতে পারিলে অধিক ফলন পাওয়া সম্ভব। জমি তৈরীর সময় ৮-১০ কে.জি. এ্যামোনিয়াম সালফেট মিশাইয়া দিতে হয়। বাকী ৮-১০ কে.জি., গাছ যখন ১ হাত পরিমাণে দাঁড়াইবে তখন

ছিটাইয়া দিতে হয়। ঐ সময় মাটি ভিজা না থাকিলে একটি হালকা সেচ দিলে তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যায়।

কি করিয়া বুনিতে হয়—বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। বিঘা প্রতি বীজ লাগিবে ৪-৫ কে.জি.। ভুট্টা বোনার মতোই বীজ বুনিয়া দিয়া মই ঢাকা দিয়া দিতে হয়। জমিতে ভাল জোঁ থাকাকালীন বীজ বুনিতে হয়। অল্প জোঁ থাকিলে অংকুর বাহির হইতে দেরী হয়। গাছ যখন ৯-১২ ইঞ্চি হইবে তখন আগাছা নিড়াইয়া দিন। যদি বা যখন খরাক্লীষ্ট হইয়া পাড়লে সেচ দিয়া দিন। বিঘা প্রতি ১৮-২০ কে.জি. এ্যামোনিয়াম সালফেট দুইবারে দিলে ভাল ফলন হয়। প্রথমবার কমবেশী অর্দ্ধেকটা পরিমান জমি তৈরী ও বীজ বোনার সময় দিয়া দিবেন। গাছ যখন দেড় দুই ফিট উঁচু হইবে তখন বাকী অর্দ্ধেক ছিটাইয়া সেচ দিয়া দিন।

কি করিয়া ফলন লইতে হয়—বোনার ৮০-৯০ দিনের মধ্যেই ফলন নিবার উপযোগী হয়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বোনা ফসল আষাঢ় শ্রাবণ মাসে এক বার কাটিয়া নিন। পরের কাটিং আবার ৩০-৪০ দিন পরে ভাদ্র আশ্বিন মাসে নিতে পারিবেন। দুই ফসলের ফলন, এক ফসলের ফলনের চাইতে কিছু বেশী হইবে। বিঘা প্রতি ফলন দাঁড়াইবে ৪০-৫০ কুইন্টাল। যদি বীজ রাখেন তবে আষাঢ় শ্রাবণের বোনা ফসল হইতেই বীজ সংগ্রহ করিতে হইবে। বীজ পাকিতে প্রায় কার্ত্তিক মাস। বিঘা প্রতি বীজের ফলন পাবেন ১½-২ কুইন্টাল পর্য্যন্ত। বীজ নেবার পর প্রায় শুকনো ঘাসগুলিকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার না করিয়া, গুঁড়াইয়া নিয়া বলদ গরুকে অন্য খাবারের সহিত খাওয়ানো চলিতে পারে। বীজ ভাঙিয়ে নিয়া অন্য সুষম খাদ্যের সহিত মিশাইয়া দুগ্ধবতী গাভীকে খাওয়ানো যাইতে পারে এবং তাহাতে ভাল ফল পাওয়া যায়। সবুজ ঘাস হিসাবে খাওয়ানো ছাড়াও সাইলেজ তৈরী করার জন্য এই ঘাস উপযোগী। বরবটি সয়াবীন ইত্যাদি ঘাসের সহিত মিশাইয়া বুনিলে ঘাসের খাদ্যমান বাড়ে এবং গবাদি পশু তৃপ্তির সহিত আহার করে। ভুট্টা ঘাসের তুলনায় টিওসিনটির পাতা একটু কর্কশ এই কারণেই মিশ্র ফসল তৈরী করার সুফল আছে।



টিওসিনটি

ভুট্টা—৪

পৃথিবীর সকল দেশেই ভুট্টার চাষ ব্যপকভাবে বাড়িয়া গিয়াছে কারণ মানুষের খাদ্য হিসাবে ভুট্টার চাহিদা ক্রমান্বয়েই বাড়িতেছে। পশুখাদ্য হিসাবে ভুট্টা গাছ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে বরাবরই সমাদৃত ছিল। কেননা এই গাছ জন্মাইতে সময় লাগে তুলনামূলকভাবে অনেক কম, ফলন হয় বেশী আর পশুখাদ্যে মুখরোচক ও পুষ্টিকর। আমাদের দেশে ভুট্টার চাষ দীর্ঘদিন থেকেই প্রচলিত আছে কেননা আমাদের দেশের আব হাওয়া ভুট্টা চাষের উপযোগী। আজকাল অবশ্য শীতকালীন ভুট্টা চাষের উপযোগী করিয়া ভুট্টা বীজ উন্নততর করা হইয়াছে। তবুও ভুট্টার চাষ গরম আব-হাওয়ায়ই ব্যাপক। যে সব অঞ্চলে দিনের তাপমাত্রা বেশী এবং রাতের তাপ-মাত্রা একেবারে নীচে নামিয়া আসে না সেই সব অঞ্চলই ভুট্টা চাষের বিশেষ উপযোগী। খুব বেশী বৃষ্টি বা খুব বেশী গরম হাওয়া এই দুই-ই ভুট্টা চাষের অত্যন্ত অনুপোযোগী। জল দাঁড়াতে না পারে এমন দোঁয়াশ মাটিই ভুট্টা চাষের উপযোগী।

কখন লাগাইতে হয়—চৈত্র মাসের মাঝামাঝি থেকেই ভুট্টার চাষ চলিতে পারে যদি এই সময়ে বৃষ্টি পাওয়া যায় বা সেচের ব্যবস্থা থাকে। চাষ চলতে পারে ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত। চৈত্র বৈশাখ মাসের চাষ তুলনামূলক উঁচু জমিতেও হইতে পারে কেননা জমিতে হঠাৎ জল দাঁড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। খুব খরায় পড়িয়া গেলে সেচ দিবার ব্যবস্থা থাকা চাই।

কি করিয়া জমি তৈরী করিতে হয়—জল নিস্কাশনের ভাল ব্যবস্থা আছে এমন দোঁয়াশ মাটিতে ভুট্টার চাষ ভাল হয়। ৫-৬ বার চাষ ও মই দিয়া জমি ভালভবে তৈরী করিতে হয়। জমি তৈরী করার সময় বিঘা প্রতি ১২-১৫ কুইন্টাল গোবর সার ছড়াইয়া দিয়া ভাল করিয়া জমি তৈরী করিয়া নিন। বীজ বোনার আগে ১৫-২০ কে.জি. এ্যামোনিয়াম সালফেট জমিতে দিয়া দিলে ভাল ফলন হইবে। বিঘা প্রতি ১২-১৫ কে.জি. সুপার ফসফেট

দিয়া দিলে ভাল হয়। চৈত্র বৈশাখ মাসে চাষ দিবার সময় যদি বৃষ্টি না পাওয়া যায় এবং মাটি শক্ত থাকে তবে হালকা সেচ দিয়া মাটি ভিজাইয়া নিন তাহা হইলে চাষ ও মই দিয়া জমি তৈরী করিতে সুবিধা হইবে।

কি করিয়া বুনিতে হয়—ছিটিয়ে বুনুন। বিঘা প্রতি বীজ লাগিবে ৬-৭ কে.জি. যদি লাইনে বুনেন তবে বীজ লাগিবে অর্দ্ধেকেরও কম। লাইনে বুনিলে বীজে বীজে ব্যবধান রাখিবেন ১০-১২ ইঞ্চি, লাইনে লাইনে ব্যবধান রাখিবেন এক হাত (১৮ ইঞ্চি)। ঘাস এর জন্য ছিটাইয়া বোনাই ভাল এবং বিঘা প্রতি বীজ আরো একটু বাড়াইয়া ৮ কে.জি. পর্যন্ত ব্যবহার করিতে পারেন। ইহাতে ঘন গাছ বাহির হইবে, গাছের কাণ্ড সরু থাকিবে ও ঘাসের ফলন বিঘা প্রতি একটু বেশীই পাওয়া যাইবে। দীর্ঘ সময়ের জন্য যদি জমি আটকাইয়া রাখিতে পারেন তবে লাইনেও ভুট্টা বোনা যায়, কারণ একটি বিশেষ সময়ের ব্যবধান রাখিয়া দুই লাইনের মধ্যবর্তী জায়গায় লাইনে বীজ বুনিয়া গেলে, আগের ফসল যখন কাটিয়া গবাদি পশুকে খাওয়াইবেন তখন পরে বোনা গাছগুলি তৈরী হইতে থাকিবে। সীমিত সংখ্যক গবাদি-পশু যারা পোষেন তাহাদের পক্ষে এই পদ্ধতির চাষ উপযোগী, কারণ দৈনন্দিন তাহার প্রয়োজনীয় ঘাস কাটিয়া নিতে পারিবেন এবং একটি নৈমিত্তিক কাঁচা ঘাসের যোগান চালু রাখাও সম্ভব হইবে।

কি করিয়া ফলন লইবেন—ঘাস হিসাবে ভুট্টা বোনার ৬০-৭০ দিনের মধ্যেই কাটিবার উপযুক্ত হইয়া যায়। বিঘা প্রতি এই ঘাসের ফলন পাইবেন ৩০-৩৫ কুইন্টাল। বীজ সংগ্রহ করিলে বীঘা প্রতি বীজ পাইতে পারেন ৪-৫ কুইন্টাল। ঘাস হিসাবে ফসল সংগ্রহের সব চাইতে ভাল সময় যখন ভুট্টার ফলনগুলি কচি, নরম ও দুধেল অবস্থায় থাকে। এমন অবস্থায় ঘাসে প্রচুর পুষ্টি থাকে এবং গোখাদ্যের জন্য বিশেষ উপকারী। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ের বোনা ফসল ভাদ্র আশ্বিনে কাটিবার উপযুক্ত হয়। ভুট্টা ঘাস জরুরী ভিত্তিক বোনা হইলে ৪৫ দিনের মধ্যেই কাটিয়া খাওয়ানো যাইতে পারে। দুই অন্তবর্তী অর্থকরী ফসলের মাঝখানে এই স্বল্পকালীন ৪৫ দিনের মধ্যে ভুট্টার ঘাস চাষ করিয়ে নেওয়া খুবই লাভজনক।

জোয়ার—৫

জোয়ার ঘাস গোপালক ও চাষীভাইদের কাছে আজ স্বীকৃত ও বহুপরিচিত পশুখাদ্য। পশ্চিম বাংলার কোন কোন অঞ্চলে এই জোয়ার ঘাস গেমা ঘাস বলে চাষীভাই ও গোপালকদের কাছে পরিচিত। আজকাল এই জোয়ার ঘাসের চাষ পশুখাদ্য হিসাবে পশ্চিম বাংলায় ব্যপক ভাবেই হয়। পশুখাদ্য হিসাবে এই জোয়ার ঘাস চাষের ব্যপকতার কারণ হিসাবে বলা যাইতে পারে এই ঘাস বুনিবার পর বস্তুত কোন পরিচর্যারিই দরকার হয়না। জমিতে কিছুমাত্র জোঁ থাকিলেই বীজ হইতে চারা বাহির হইয়া আসিবে। খরা সহ্য করারও ক্ষমতা আছে এবং ফলনও হয় প্রচুর। বীজ বোনার পর বৃষ্টির জল যেন জমিতে না দাঁড়াইতে পারে সেই বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকা প্রয়োজন। বৃষ্টির জল দাঁড়াইলে এই ঘাস লাল হইয়া যায় আর তাহা রোধ করা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইহা ব্যতীত ফসল হানির আর কোন আশংকা থাকেনা। জোয়ার ঘাস যেমন খরা সহ্য করিতে পারে তেমন পশ্চিম বাংলার চৈত্র বৈশাখ মাসের (গরম, অল্পবৃষ্টি ও আবহাওয়ার আদ্রতা) আবহাওয়ায় গাছ তাড়াতাড়ি বাড়িয়া উঠিতে সক্ষম হয়। জোয়ার ঘাস প্রায় সকল প্রকার মাটিতেই জন্মায়। এই ঘাস এঁটেল ও এঁটেল দোঁয়াস মাটিতে ভাল জন্মায় তাই পশ্চিম বাংলার প্রায় সমস্ত অঞ্চলেই জোয়ার ঘাসের চাষ এতো প্রসার লাভ করিয়াছে।

কখন লাগাইতে হয়—বৈশাখের প্রথম হইতেই জোয়ার ঘাস বোনা চলে। শ্রাবণ পর্য্যন্ত বোনা যায়। তবে অল্প বৃষ্টি ও গরম আবহাওয়া বৈশাখ মাসেই থাকে আর সেই সময়ই চাষের সব চাইতে উপযোগী। আযার শ্রাবণে বুনিতে হইলে খুবই উঁচু জমিতে বুনিতে হয়। এই সময় বৃষ্টি বাড়িয়া যায় ফলে আবহাওয়ার আদ্রতাও বাড়িয়া যায়, তবে রোদ আর বৃষ্টি পর্যায়ক্রমে থাকিলে ফলন ভালই হয়। কি করিয়া জমি তৈরী করিতে হয়—মৌসুমি বৃষ্টি আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে জমি ৩—৪ চাষে ভাল করে তৈয়ী করিয়া নিন। বিঘা প্রতি ১২—১৫ কুইন্টাল গোবর সার জমি তৈরীর সময় দিয়া দিবেন। জমির

উর্বরতা যদি কম থাকে তবে বিঘা প্রতি ২৫—৩০ কেজি এ্যামোনিয়াম সালফেট দিতে হইবে। অর্দ্ধেক পরিমাণ জমি তৈরীর সময় দিয়া দিন, আর বাকী অর্দ্ধেক ফসল যখন ১-১২ ফিট হইবে তখন ছড়াইয়া দিন। বৈশাখ মাসে জমি তৈরীর সময় যদি মাটি শক্ত থাকে এবং বৃষ্টি না পাওয়া যায় তবে একটি হালকা সেচ দিয়া জমি ভিজাইয়া লইলে পরে চাষ ও মই দিয়া জমি চৌরষ করা সহজ হয়। যে সকল নীচু জমিতে চৈত্র বৈশাখ মাসে জোয়ার ঘাস বোনা হয়। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে তাহা কেটে তুলে নিয়ে, ধান চাষের ব্যবস্থা করা যায় কিন্তু যে সকল উঁচু জমিতে ধান চাষ হয়না কিংবা পাটের ফলন নেয়া কমে গেছে তেমন জমিতে আষাঢ় শ্রাবণে চাষীভাইয়েরা বা গোপালকেরা শীতকালীন সব্জী চাষের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন তাই আশ্বিনের শেষ বা কার্তিকের প্রথমেই জমি থেকে জোয়ার ঘাস তুলিয়া নিবার জন্য আগ্রহী হন।

কি করিয়া বুনিতে হয়—ছিটাইয়া বুনুন। বিঘা প্রতি ৫—৬ কে. জি পর্য্যপ্ত বীজ ব্যবহার করা যাইতে পারে। হালকা মই চাপা দিয়া দিন। জমিতে জোঁ থাকিলে ১ সপ্তাহের মধ্যেই সমস্ত বীজের অঙ্কুর বাহির হইয়া আসিবে। বৈশাখে বোনা ফসল যদি খরায় পড়ে তবে ৪—৫ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বাড়ন্ত অবস্থায় একটি হালকা সেচ দিয়া দিতে হইবে। যদি জমিতে পর্য্যন্ত জোঁ থাকে তাহা হইলে সেচের প্রয়োজন হইবেনা। খরা পরিস্থিতি চলিতে থাকিলে গাছ ১½ ফিট উঁচু হইলে আবার একটি হালকা সেচ দিয়া দিলে ফসল নিশ্চিত হইবে। বৃষ্টি পাইয়া গেলে আর সেচের দরকার হইবে না। অধিক পুষ্টি ও অধিক ফলনের জন্য জোয়ার ঘাস, বরবটি ও ফিল্ডবীন ইত্যাদি শিম্ব জাতীয় ঘাসের সহিত মিশাইয়া বোনা চলে কিন্তু মৃত্তিকা, আবহাওয়া ও বৃষ্টিপাত এই সকলের উপযোগী হওয়া চাই।

কি করিয়া ফলন লইতে হয়—ফসল লইবার উপযুক্ত সময় যখন গাছ ফুল বাহির করিবার পর্য্যায়ে আসে। এমন অবস্থায় আসিতে বোনার পর প্রায় ৮০ দিন সময় লাগে। ৬০ দিনের আগে কোন অবস্থায়ই এই ঘাস কাটিয়া গরু বাছুরকে খাওয়ানো উচিত নয় কারণ কাঁচ অবস্থায় এই ঘাসের মধ্যকার পাতার নীচের দিকে এক প্রকার বিষ (সিয়ানোজেনিক গ্লুকোসাইড) থাকে। এমন বিষক্রিয়া হইলে গরু-বাছুর মারা যায় এব্যপারে গোপালকদের সতর্ক থাকা একান্ত উচিত। এরূপ হইলে গাছ সবুজ রং হারাইয়া ফিকে হইয়া

যার অথবা অনেক সময় দেখা যায় জোয়ার গাছ খর্বাকৃতি হইয়া রহিয়াছে, বাড়ন নেই এবং হাল্কা হলদেটে রং হইয়া গিয়াছে, তেমন অবস্থা খরায় পড়িলেও যেমন হইতে পারে, জমিতে অতিরিক্ত সময় বৃষ্টির জল দাঁড়াইলেও ইহা হইতে পারে। যে কোন কারণেই হোক না কেন এমন ধারার অবাড়ন্ত, খর্বাবৃতি, ফিকে সবুজ বা হলদেটে গাছগুলিতে ঐ বিষ বর্তমান থাকে। বিঘা প্রতি ঘাসের ফলন পাওয়া যায় প্রায় ৩৫—৪০ কুইন্টাল। বীজের ফলন পাইবেন বিঘা প্রতি ২—৩ কুইন্টাল। বৈশাখে বোনা ফসলের ফলন নিতে পারিবেন শ্রাবণে। যত পরে বোনা ফসল, তত পরেই ফলন লইতে হয়। এইভাবে আশ্বিনের শেষ ও কার্তিকের প্রথম অবধি ফলন নেওয়া যাইতে পারে। জোয়ার বীজ সংগ্রহ করিতে হইলে আষাঢ় শ্রাবণে উঁচু জমিতে বোনা ফসল হইতেই বীজ সংগ্রহ করা ভাল ও নিরাপদ। ফল পাকিতে আরম্ভ করিবে আশ্বিনের মাঝামাঝি হইতে কার্তিক মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত। ফসল কাটিয়া নিবার পর আবার নূতন পাতা বাহির করিয়া গাছ বাড়ন নেয়। উহাকে র‍্যাটুন বলে। তেমন গাছেও গ্লুকোসায়ানেড বিষ থাকে। সুতরাং র‍্যাটুন গাছ গরু বাছুরকে খাওয়ানো যায়না। মনে রাখিবেন গরু বাছুর যেন র‍্যাটুন হওয়া মাঠে না চরিয়া বেড়ায়। খরাজনিত বা ভিন্ন কারণে বাড়নহীন গাছে যে গ্লুকোসায়ানেড বিশ থাকে উহা সাইলেজ তৈরীতে রাসায়নিক বিক্রিয়ায়ায় নষ্ট হইয়া যায় এবং প্রুসিক এ্যাসিড জনিত বিষক্রিয়ার কোন ভয় থাকে না। সুতরাং বাড়নহীন জোয়ার ঘাসে সাইলেজ তৈরী করাই বিধেয়। সাইলেজ প্রস্তুতকরণ পরবর্তী অধ্যায় বলা হইল।

গাইমুগ—৬

রাইসবিন

চাষিভাইদের কাছে এই ঘাস গাইমুগ নামে পরিচিত। কোথাও কোথাও এই ফসলকে গাইকলাইও বলে। শুটি জাতীয় ঘাস হিসাবে গাইমুগ খুবই পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। তার কারণ হিসাবে বলা যাইতে পারে এই ঘাস বোনার পর দীর্ঘদিন থাকে কারণ এই ঘাসের শিকড় মাটির বেশ তলায় চলিয়া যায়, তাই শুস্ক আবহাওয়া সহ্য করিতে পারে। গোপালক ও চাষীভাইদের কাছে এই গাইমুগের একটি বিশেষ সুবিধা হল, যদি বৈশাখ মাসের শুরু হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে বোনা হয় তবে এই ঘাস মাঘ মাঘ পর্য্যন্ত সবুজ থাকে। আর যদি ভাদ্র আশ্বিনে বোনা হয় তবে যদিও শীতের সময় কম বাড়ে কিন্তু গরম আবহাওয়া শুরু হইবার সাথে সাথে (ফাল্গুন মাসে) খুব তাড়াতাড়ি বাড়িতে আরম্ভ করে, আর ৮০—১০০ সেন্টিমিটার পর্য্যন্ত উঁচু হয় (৩—৩½ ফুট)। শুটি জাতীয় ঘাস বলে ইহা মাটির উর্বরতা বাড়ায়।

কখন লাগাইতে হয়—বৈশাখ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত ইহা লাগানো চলে। খুব বর্ষায় বা খুব খরায় লাগাইবেন না। এমন সময় বুঝিয়া বুনিবেন যাতে বুনিবার পর দু এক পশলা হালকা বৃষ্টি পাইয়া যায় অথবা খরা হলে হালকা সেচ দেয়া সম্ভব হয়। বীজ নিতে হইলে আশ্বিনের দিকে বোনা ফসল হইতেই নিতে হইবে কেননা ফাল্গুনে এই ঘাসের ফুল ও ফল ধরে।

কি করিয়া জমি তৈরী করিতে হয়—উঁচু দোঁআশ মাটিই এই ঘাসের পক্ষে উপযোগী তবে এঁটেল দোঁআশ মাটিতেই ভাল জন্মায়। ৫—৬ চাষ ও মই দিয়া জমি তৈরী করিয়া নিন। জমি তৈরীর সময়ই বিঘা প্রতি ১০—১২ কুইন্টাল গোবর সার দিয়া দিন। আশ্বিন মাসে বোনা ফসলের বীজ নিতে হইলে জমি তৈরীর সময়ই ২৫—৩০ কে জি সুপার ফসফেট দিয়া দিবেন।

কি করিয়া বুনিতে হয়—বীজ ছিটাইয়া বুনন। বিঘা প্রতি ৩—৪ কেজি বীজ প্রয়োজন হয়। জমিতে ভাল জোঁ থাকিলে ৩—৪ দিনের মধ্যেই গাছ বাহির হইবে। এই সময় পাখী কিছু বীজ নষ্ট করিয়া দিতে পারে তাই পাখী হইতে সাবধান হইতে হইবে। সাধারণত ঘাস হিসাবে ফলন নিতে আর বিশেষ যত্ন লইতে হয়না। তবে গাছে যদি (শুঁয়ো) পোকা লাগিয়া যায় তবে ঔষধ ছিটাইয়া দিতে পারেন। মনে রাখিবেন ঔষধ যেন খুব বিষাক্ত (সিসটেমিক ইনসেকটিসাইড) না হয়। কখনো কোন ঔষধ ব্যবহার করিলে (অন্তত তিন সপ্তাহ) বেশ কিছুদিন ছেড়ে দিবার পরে গরু বাছুরকে সেই ঘাস খাওয়াইবেন।

কি করিয়া ফলন লইতে হয়—বৈশাখ জৈষ্ঠ্য মাসের বোনা ফসল শ্রাবণ ভাদ্র মাসে তোলা যায়। ফলন হইবে বিঘা প্রতি প্রায় ২০ কুইন্টাল। প্রয়োজন অনুযায়ী দৈনিক গরুকে কাটিয়া খাওয়াইতে পারে। আর যদি জমি একসঙ্গে খালি করিয়া অন্য ফসল লাগাইতে চান তবে ঘাস তুলিয়া নিয়া ছায়ায় আনিয়া ছড়াইয়া রাখুন, মাঝে মাঝে ঘাটিয়া দিন, ছায়াতে রাখিয়া পুরোপুরি শুকাইয়া নিন। পরে বাণ্ডিল করিয়া তুলিয়া রাখুন। যদিও সবুজ ঘাসের তুলনায় এর খাদ্যগুণ অনেক নেমে আসে তবুও সাধারণ খড় বিচুলির তুলনায় এর খাদ্যমান অনেক উঁচুতে থাকে। ভাদ্র আশ্বিন মাসের বোনা ফসল হইতে বীজ রাখুন। যদি গাছে পোকা লাগে ঔষধ ছিটাইয়া তাকে সংরক্ষণ করুন। ফাল্গুন চৈত্র মাসেই বীজ সংগ্রহ করা যায়। গাছ সহ তুলেয়া এনে রৌদ্রে শুকিয়ে নিয়ে মাড়িয়ে (পিটিয়ে) বীজ বের করে নিন। বীজ ঝেড়ে রোদ খাওয়াইয়া নিন। বিঘা প্রতি বীজের ফলন পাইবেন প্রায় দুই কুইন্টাল। যে ভূষা থাকিয়া গেল তাহাও গরুকে খাওয়ানো যাইতে পারে। সাধারণত বলদ গরুকে এই ভুষা দেওয়া হয়। দুধ না দেওয়া গরুকে এবং বকনা বাছুরকে বিশেষ প্রয়োজনে দেওয়া যাইতে পারে।

বিশালমুগ—৭

টেট্রাকলাই

চাষি ভাইদের নিকট এই ঘাস বিশাল মুগ নামে পরিচিত। শুঁটি জাতিয় ঘাসের মধ্যে বিশাল মুগই অধিক ফলনশীল। যদিও এই ঘাস খরিপ খন্দের ঘাস তবুও বছরের সকল সময়ই এই ঘাস জমিতে থাকে কারণ এই ঘাসের শিকড় খুব মাটির তলায় চলিয়া যায় তাই বেশ খরা সহ্য করিতে পারে। এই ঘাস বছরে দুইবার কাটা চলে এবং যখন অন্য ঘাসের অভাব হইয়া পড়ে, এই ঘাস তখন অভাব পূরণ করিতে পারে। এই ঘাসের বীজ সংগ্রহ খুবই ধৈর্য্য ও শ্রমসাপেক্ষ কেননা এই ঘাসের বীজপত্র ফাটিয়া বীজগুলি মাঠেই পড়িয়া যায় যদিনা ধৈর্য্যের সঙ্গে নজর রাখিয়া ঠিক সময় মতো বীজপত্রগুলি তুলিয়া আনা না যায়। তাই বীজ পাকিয়া আসিলে রোজই মাঠে নজর রাখিতে হয় এবং প্রতিদিন ঐ দিনের পাকা বীজ সংগ্রহ করিতে হয়। এমন করিয়া প্রায় তিন মাস পর্য্যন্ত মাঠ হইতে বীজ সংগ্রহ করিতে থাকিলে বিঘা প্রতি ১৫০-১৬০ কে. জি. বীজ সংগ্রহ করাও কঠিন হইয়া পড়ে।

কখন লাগাইতে হয়—এই ঘাস বছরের প্রায় সব সময়েই লাগানো চলে। জৈষ্ঠ্য হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত, আবার আশ্বিন মাসেও লাগানো চলে। তবে বৈশাখ মাসের শেষ ও জৈষ্ঠ্য মাসই লাগাইবার ভাল সময়। তখন উঁচু জমিতে বুনিলে ফলন কিছু বেশী পাওয়া যায়। আর ভাদ্র আশ্বিন মাসে বুনিলে তুলনামূলকভাবে ফসল কিছু কম হইবে।

কি করিয়া জমি তৈরী করিতে হয়—জল দাঁড়াইতে পারে না এমন উঁচু দোঁয়াশ মাটি এই ঘাস চাষের সম্পূর্ণ উপযোগী। ৪-৫ চাষ ও মই দিয়া জমি ভালভাবে তৈরী করিয়া নিন। জমি তৈরী করিবার সময় ১২-১৫ কুইন্টাল

গোবর সার দিয়া জমি তৈরী করুন। গোবর সার যদি না পাওয়া যায় তবে বিঘা প্রতি ৩০-৩৫ কে. জি. সুপার ফসফেট এবং ৬-৭ কে জি এ্যামোনিয়াম সালফেট জমি তৈরীর সময়েই দিয়া দিন।

কি করিয়া বুনিতে হয়—ছিটাইয়া বুনুন। বিঘা প্রতি বীজ লাগিবে ৪ কে, জি। লাইনেও বুনিতে পারেন। প্রায় ১ হাত অন্তর অন্তর বীজ পুতিয়া যান। এতে বীজ কিছু কম লাগিবে। তবে ঘাসের জন্য ছিটাইয়া বোনাই কম ব্যয়সাপেক্ষ, কিন্তু বীজ নিবার সময় লাইনে বোনাই ঠিক হইবে। লাইনে বুনিলে এক হাত (১৬-১৮ ইঞ্চি) অন্তর অন্তর বীজ বুনিবেন।

কি করিয়া ফলন লইতে হয়—বুনিবার তিন মাস পরই এই ঘাস কাটিবার উপযুক্ত হয়। আশ্বিন মাস হইতে এই ঘাসে ফুল ও ফল ধরিতে শুরু করে। ঘাস কাটিবার সব চাইতে উপযুক্ত সময় এইটাই। মাটি হইতে ১০-১২ ইঞ্চি ছাড়িয়া দিয়া কাটিয়া নিতে হয় তবেই আবার ফলন হইবে। গাছ আবার ঝোপড়া হইয়া বাড়িয়া উঠিবে। একবার কাটিয়া নিলে ঘাসের ফলন হয় বিঘা প্রতি প্রায় ২০ কুইন্টাল। ফসল যদি দুইবার কাটা যায় তবে ফলন ২০ কুইন্টালের বেশী হইবে। এই ঘাসের বীজ সংগ্রহ ধৈর্য্য, সময় ও শ্রমসাপেক্ষ হইয়া পড়ে। তাই চাষী ভাইরা নিজেদের প্রয়োজনীয় বীজ আপন আপন জমি হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিলেই ভাল হয় কারণ এই বীজের যেমন সরবরাহ কম তেমন দামও বটে। বিঘা প্রতি বীজের ফলন পাবেন প্রায় ১½ কুইন্টাল।

বরবটি—৮

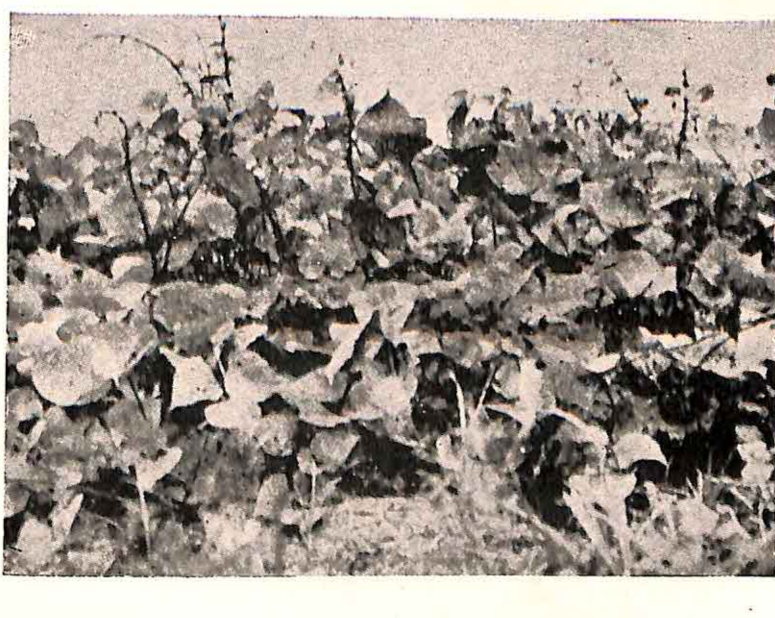
বরবটি ঘাস চাষী ভাইদের ও গোপালকদের কাছে খুবই পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। শুঁটি জাতীয় ঘাসের মধ্যে সব চাইতে কম সময়ে এই ঘাস উৎপন্ন করা যায়, মাত্র দুইমাস সময় নেয় এবং বছরের প্রায় যে কোন সময়ই জন্মানো যায়। বিশেষ করিয়া ফাল্গুন হইতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত। তাই দুই অর্থকরী ফসলের অন্তবর্তী কালীন ফসল হিসাবে এই ঘাসেয় চাষ হইতে পারে, আর এই ঘাস যে কোন ধরনের মাটিতে জন্মায়, খরাও সহ্য করিতে পারে আবার অল্প বৃষ্টিতেও দাঁড়াইতে পারে। কিন্তু বেশী বৃষ্টিতে যদি জল দাঁড়াইয়া যায় তবে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই গাছ ঢলিয়া পড়িবে ও মরিয়া যাইবে। বড় গাছের ছায়াতেও বরবটি জন্মানো যায় কিন্তু শীত সহ্য করিতে পারে না। বড়বটি মানুষের খাদ্য ছাড়াও পশু খাদ্যের উপযোগী ভ্যারাইটির চাষ হয়, গোপালকদের কাছে উহা পরিচিত।

কখন লাগাইতে হয়—বৈশাখ মাসই বরবটি ঘাস লাগাইবার উপযুক্ত সময়। ফাল্গুন হইতেই বোনা যাইতে পারে, আশ্বিন মাস পর্যন্ত বোনা যায়। তবে বেশী ঘাস ফলাইতে হইলে বৈশাখ জৈষ্ঠ মাসেই লাগাইতে হয় যেন ভালভাবে বৃষ্টি পায়, বীজ নিতে হইলে ভাদ্র আশ্বিনে বোনা ঘাস হইতেই নিতে হয়।

কি করিয়া জমি তৈরী করিতে হয়—প্রায় সকল রকম মাটিতেই বরবটি ঘাস জন্মানো চলে তবে এঁটেল দোঁয়াশ মাটিই বরবটি চাষের উপযুক্ত। উঁচু জমিতে বরবটি চাষ হয়, নীচু জমিতে চাষ চলে না কারণ মাত্র কয়েক ঘন্টা (৩-৪) জল দাঁড়াইলেই সম্পূর্ণ ফসল নষ্ট হইয়া যাইবে। তাই নীচু জমিতে বরবটি চাষ কারিলে জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত রাখিতে হইবে, যেন নালা কাটিয়া সম্পূর্ণ জল বাহির করিয়া দেওয়া সম্ভব হয়। ৪-৫ চাষ ও মই দিয়া ভালভাবে জমি তৈরী করিয়া নিন। জমি তৈরী কয়িবার সময় বিঘা প্রতি ১০-১২ কুইন্টাল গোবর সার দিয়া দিন। বীজ রাখিতে হইলে বীঘা প্রতি ২৫-৩০ কেজি সুপার ফসফেট দিয়া দিবেন' জমি তৈরীর সময়ই। জমি যদি



গাইমুগ



খুবই অনুর্বর হয় তবে বিঘা প্রতি ৫-৬ কে, জি, এ্যামোনিয়াম সালফেট এই সময়েই দিয়া দিন।

কি করিয়া বুনিতে হয়—ছিটাইয়া বুনুন। বিঘা প্রতি বীজ দরকার হইবে ৪-৫ কেজি। জোঁ বুঝিয়া বীজ বুনিবেন। জোঁ কম থাকিলে চারা বাহির হইতে দেরী হইবে। বীজ বোনার ১০-১২ দিনের ভিতর যদি বৃষ্টি না হয় আর জমিতে যদি তেমন জোঁ না থাকে তবে একটি হালকা সেচ দিয়া দিন, সমস্ত চারা বাহির হইয়া আসিবে। বরবটি ঘাস ভুট্টার সহিত মিশাইয়া বোনা চলে এবং জোয়ার ঘাসের সহিতও মিশাইয়া বোনা চলে, এমন ক্ষেত্রে বরবটির বীজ দিতে হইবে বিঘা প্রতি মাত্র ২ কি, জি।

কি করিয়া ফলন লইতে হয়—বুনিবার দুই মাসের মধ্যেই এই ঘাস কেটে খাওয়াইবার উপযুক্ত হয়। যদি বৈশাখের প্রথম দিকে বুনেন আর বৃষ্টি না পান তবে ফলন নিতে দুটি হাল্কা সেচের প্রয়োজন হইবে। পরে বোনা ফসল সাধারণত বৃষ্টি পাইয়া থাকে, তাই সেচের দরকার হয় না। বিঘা প্রতি ঘাসের ফলন পাইবেন প্রায় ১৫-২০ কুইন্টাল। বীজ রাখিতে হইলে ভাদ্র মাসের বোনা ফসল হইতে রাখিবেন। ফল ছড়ার (পডের) মধ্যে হয় তাই যখন ফসল পাকিতে থাকে তখন খুব নজর রাখিতে হয়। ছড়া বেশী শুকিয়ে গেলে ফাটিয়া যায় এবং ভিতরের বীজগুলি মাঠেই পড়িয়া যায়। বীজ পাকিতে আরম্ভ করিলে ঠিক একই সঙ্গে পাকে না। তাই এই সময়ে প্রতিদিন মাঠে ঘুরিয়া শুকনো ও পাকা ছড়া গুলি (পড) তুলিয়া আনিবেন। রৌদ্রে ছড়িয়ে শুকোতে দেবেন এবং বীজ ছাড়িয়ে নিবেন। কয়েক দিনের ভিতর সম্পূর্ণ বীজ পাকিয়া উঠিলে সারা মাঠের ফলন নিয়া নেবেন এবং একই পদ্ধতিতে বীজ সংগ্রহ করিবেন। বিঘা প্রতি বীজের ফলন পাইবেন প্রায় ২ কুইন্টাল। বরবটি ঘাসের সহিত জোয়ার ঘাস মিশ্রিত থাকিলে এবং উহা উপযুক্ত সময়ে গবাদি পশুকে খাওয়াইলে সুফল বেশী পাওয়া যায়। বরবটি ঘাসে ছিবড়া তুলনামূলক ভাবে কম থাকায় পরিপাক ও পুষ্টির জন্য লুসার্ণ বা বারসীম ঘাসের সহিত তুলনা করা চলে।

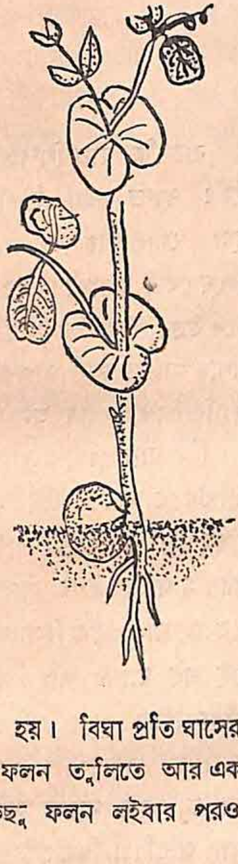
মটর—৯

ইহা শীতকালীন শুঁটি জাতীয় ঘাস। অল্প শীত শুরু হতেই ইহার চাষ আরম্ভ হয়। এই মটরশুঁটি গাছ জন্মাইতে লাগে মাত্র ৬০ দিন। খুব অল্প সময়ের ঘাস। এই ঘাস চাষে তেমন জলের দরকার হয় না। উঁচু জমিতে জন্মানো যায় আর খুব একটা উর্বরা জমিরও প্রয়োজন হয় না। মটরশুঁটি মানুষের খুবই প্রিয় খাদ্য। কিন্তু মটরশুঁটি গাছ পশু খাদ্য হিসাবে আমাদের দেশে অনেক আগে থেকেই বহুল প্রচারিত। পশ্চিমবাংলার চাষীভাইদের নিকট মটরশুঁটি চাষ খুবই পরিচিত। কেননা আমাদের দেশের আবহাওয়ায় মটরশুঁটি বেশ ভালই জন্মায়। চাষ পদ্ধতিও সহজ। বলিতে গেলে চাষের পরবর্তী পরিচর্য্যা তেমন দরকার হয় না। আর যখন ফলন ওঠে তখন অন্য কোন (পশুখাদ্য) ঘাস থাকে না। কার্তিক অগ্রাহায়ণে ধান কাটিবার সঙ্গে সঙ্গে সেই সব জমিতে মটরশুঁটির চাষ চলিতে পারে। দুই অর্থকরী ফসলের মাঝখানে অল্পদিনের মধ্যেই এই ঘাস তুলিয়া নেওয়া যায়।

কখন লাগাইতে হয়—আমাদের দেশে মটরশুঁটির চাষ সাধারণতঃ কার্তিকের মাঝামাঝি হইতে শুরু হয় আর অগ্রহায়ণের ধান উঠিয়া গেলে সেইসব জমিতে মটরশুঁটি জন্মানো যাইতে পারে।

কি করিয়া জমি তৈরী করিতে হয়—এঁটেল ও এঁটেল দোঁয়াশ মাটি মটর শুঁটি চাষের উপযোগী। মটরশুঁটি বুনিবার জমি ৩-৪ চাষে তৈরী হইয়া যায়। জমি তৈরী করিবার সময় ২৫-৩০ কে.জি. সুপার ফসফেট দিয়া, জমিতে ভাল করিয়া চাষ দিয়া দিন। মনে রাখিবেন, যে জমিতে প্রচুর পরিমাণে রস আছে সেই জমিই চাষের জন্য বাছিয়া লইতে হইবে। বীজ বুনিবার আগে যদি মাটিতে উপযুক্ত জো না থাকে তবে একটি হালকা সেচ দিয়া জমি ভিজাইয়া নিন এবং উপযুক্ত জো মতো বীজ বুনুন। মটরশুঁটি চাষে বৃষ্টি বা সেচের দরকার হয়না যেমন তেমন মাটির রসেই ফসল ফলানো যায়।

কি করিয়া বুনিতে হয়—ছিটাইয়া বুনুন। বিঘা প্রতি বীজ দরকার হইবে ৭-৮ কে.জি। বুনিয়া দিবার পর নজর রাখিবেন যেন পায়রা বা পাখীতে না যায়। ৩-৪ দিনের মধ্যেই অংকুর বাহির হইবে যদি জমিতে বেশ জোঁ থাকে। বীজ বাহির হইবার পরও ১ সপ্তাহ নজর রাখিবেন যেন পাখীর উপদ্রব তখনও না হয়, কেননা বীজ বাহির হইবার সময় বীজ মাটির উপর চলিয়া আসে এবং শিকড় মাটি না ধরা অবধি মাটির উপরই থাকে। ক্রমে পাতা বাহির হইবার পর আর পাখীর উপদ্রব থাকেনা। মটর ওটস্‌এর সহিত মিশাইয়া বোনা চলে। ছিটিয়েও বুনিতে পারেন আবার লাইনেও বুনিতে পারেন। তাহলে বীজের পরিমাণ বিঘাপ্রতি মটর ২ কে.জি, ওটস্‌ ৭ কে.জি। বীজের অনুপাত ইচ্ছামতো বাড়িয়ে কমিয়েও বোনা যাইতে পারে। এমনভাবে মিশাইয়া বুনিতে হলে সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহ হইতে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই বীজ বুনিবেন। আগে বা পরে বুনিলে ফলন সেরূপ নিশ্চিত নাও হইতে পারে।



কি করিয়া ফলন লইতে হয়—বুনিবার ৭০-৭৫ দিন পরেই ঘাস হিসাবে কাটিয়া নিবার খুবই উপযুক্ত হয়। তবে ৬০ দিন পর হইতেই কাটা চলে। গাছ যখন ফল ধরিতে শুরু করে সেই সময় কাটিয়া খাওয়াইলে ফলন কিছু বেশী পাওয়া যায় আর ঘাসও অধিক মুখোরোচক ও পুষ্টিকর হয়। বিঘা প্রতি ঘাসের ফলন হইবে ১২-১৪ কুইন্টাল। মটরশুটি হিসাবে ফলন তুলিতে আর এক সপ্তাহ দেরী করিতে হয়। মটরশুটি হিসাবে কিছু কিছু ফলন লইবার পরও ঘাস হিসাবে কাটিয়া খাওয়ানো যাইতে পারে।

বারসীম—১০

বারসীম ঘাস শিম্বজাতীয়। প্রায় দুই ফিট পর্যন্ত উঁচু হয় এবং ডালপালা হয়। কান্ড সরস, ত্রিফলি পাতা চবচকে সবুজ এবং উপরিভাগ খসখসে। ফুল গোলাকার ও সাদা, বীজ ছোট ও কিডনীর মতো দেখতে রং ঈষৎ হলুদ থেকে বাদামী। ১৯০৪ সালে ঈজিপ্ট থেকে ভারতে আসে ও ১৯১৬ সনে উত্তর পশ্চিম ভারতে পশুখাদ্যের জন্য চাষ শুরু হয়। পাঞ্জাবে গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য ব্যপক চাষ হয় এবং বাংলায় এই ঘাসের চাষ বিগত দশকে গবাদি পশুখাদ্যের জন্য শুরু হয়। বর্তমানে বারসীম চাষ বেশ বেড়েছে। বারসীম ঘাস পশুখাদ্যের উৎকৃষ্টতম ঘাস। এই ঘাস যেমন মুরোচক তেমনি পুষ্টিকরও বটে। এই ঘাসে খাদ্যগুণ এতো বেশী আছে, গবাদি পশুকে সুষমখাদ্য কম দিলে বা না দিলেও চলে। যদি দুগ্ধবতী গাভীকে শুধু বারসীম ঘাসের উপর রাখা যায় তবে এদেরও সুষমখাদ্য খুব অল্প দিলেই চলে, তবে এই ঘাস একক হিসাবে গরু বাছুরকে খাওয়াইলে পাতলা গোবর আসিবে। তাই এই ঘাসের সহিত কিছু খড় বিচুলি কুচিয়ে মিশিয়ে খাওয়াইতে হয়। অথবা কিছু তুষের সহিত মিশেয়েও খাওয়ানো যাইতে পারে। সব চাইতে ভালো হয় এবং দুগ্ধবতী গাভীর জন্য ওটস্ ঘাসের সহিত অথবা যদি পাওয়া যায় নেপিয়ার ঘাসের সহিত খাওয়ানো চলিতে পারে। বারসীম ঘাস চাষের প্রধান অসুবিধা ছিল সেচ যোগ্য জমির অভাব। দ্রুত কৃষি উন্নয়ন হইবার ফলে সেচ ব্যবস্থাও ক্রমশ বাড়িয়া চলিতেছে এবং এর সঙ্গে বারসীম ঘাস চাষও বাড়িতেছে। যে সমস্ত গোপালক ও চাষীভাইরা বারসীম চাষ একবার করিয়াছেন এবং গরু বাছুরকে খাওয়াইয়াছেন তারা প্রতিবছরই এই বারসীমের চাষ করিতেছেন। সরকারী পশুপালন বিভাগের প্রচেষ্টায় ও ভরতুকি মূল্যে বারসীম ঘাস ও বীজ সরবরাহ করায় যেসব গোপালক ও চাষীভাইরা ইহা একবার উৎপাদন ও গবাদি পশুখাদ্যে ব্যবহার করিয়াছেন তাহারা তাহাদের সেচ

যোগ্য জমিতে বারসীমের চাষ পদ্ধতিগতভাবে করিতে শুরু করিয়াছেন ফলে বারসীম চাষের বীজের চাহিদাও ক্রমশ বাড়িয়া চলিতেছে। বারসীম ঘাসের বীজ পশ্চিম বাংলার খামারগুলিতে উৎপাদন করা সম্ভব হইতেছেনা। ইহার কারণ বাংলার আবহাওয়া বীজ উৎপাদনের উপযোগী নয়। প্রতি বছর পাঞ্জাব হইতে বারসীম বীজ সরবরাহ করিয়া পশ্চিম বাংলার পশুপালন বিভাগ প্রয়োজন মেটান। কোন কৃষি বীজ ব্যবসায়ি বা সংস্থা এই বারসীম বীজ সরবরাহ করেন না এবং আমদানি করেন না। কোন কোন সংস্থা অগ্রিম অর্ডারের ভিত্তিতে অবশ্য সরবরাহ করিয়া থাকেন কিন্তু সময় উহা তম সরবরাহ করিতে পারেন না।

কখন লাগাইতে হয়—কার্তিক মাসের শেষ দিক হইতে বুনিতে আরম্ভ করিয়া পৌষ মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত বারসীম ঘাস বোনা যাইতে পারে। প্রথম দিকে বুনিলে বেশী ফলন পাওয়া যাইবে, কেননা বেশী কাটিংস নেওয়া যাইবে। আর যত পরে বুনিবেন কাটিংস তত কম পাইবেন তাই ফলনও কম পাইবেন। প্রথম দিকের বোনা ফসলে বেশী ফলন পাওয়া যায় বটে কিন্তু গাছে শুয়ো জাতীয় পোকা লেগে যাবার অশেংকা দেখা দিতে পারে। নাবী বোনা বারসীমে বাড়ন কম নেয় ফলে ফলন কম হয়।

কি করিয়া জমি তৈরী করিতে হয়—বারসীম চাষ বেলে মাটি ছাড়া অপর সব মাটিতেই চাষী করা সম্ভব। তবে এঁটেল, এঁটেল দোঁয়াশ ও দোঁয়াশ মাটিই এই চাষের উপযোগী। চুন ও ফসফরাস বেশী পরিমাণে আছে এমন মাটিতে বারসীম চাষ ভাল হয়। ইহা অতি স্বল্প নোনা মাটি ও অল্প ক্ষার যুক্ত মাটিতেও জন্মানো সম্ভব কিন্তু প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়। অম্লতাযুক্ত মাটি বারসীম চাষের উপযোগী নহে। বারসীম ঘাস খরা সহ্য করিতে পারেনা আবার বরফ পড়া শীতও তেমন সহ্য করিতে পারে না। বারসীম চাষে প্রচুর জল লাগে তাই সেপ্টেম্বর মাসে বোনা ফসল মে মাস পর্য্যন্ত ফলন নিতে প্রায় ১০-১২ বার সেচের দরকার হয়। ৫-৬ চাষ ও মই দিয়া খুব ভালভাবে জমি তৈরী করিতে হয়। জমি তৈরীর সময় বিঘা প্রতি ১২-১৫ কুইন্টাল গোবর সার ও ২৫-৩০ কে.জি সুপার ফসফেট দিয়া

দিন। জমিকে খুব ভালভাবে চৌরষ করিয়া নেবেন যেন কোথাও কোন ডেলা না থাকে, বা জমিতে উঁচু নীচু ভাব না থাকে এবং একটি বেশ ছিমছাম সমতা বজায় থাকে। এবার জমিকে ছোট ছোট হাত আঁইল ধরিয়ে প্লট করিয়া নিন, ইহা যেন জমির সমতা বজায় রাখিতে আরো সাহায্য করে। ইহাতে সেচের জল আটকানো সুবিধা হয়। এবার সেচ দিয়া ছোট ছোট প্লটগুলিতে প্রায় দুই ইঞ্চি পরিমান জল দাঁড় করিয়ে দিন।

কি করিয়া বুনিতে হয়—বীজ বুনিবার আগে বীজের সঙ্গে ব্যাকটেরিয়াল কালচার ("রিহজোবিয়াম ট্রিফলি) মিশাইয়া লইতে হয়। ইহা নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া সংবহ একটা মিডিয়াম মাত্র। বীজ বুনিবার ঠিক আগেই ইহা বীজের সঙ্গে মিশাইয়া লইতে হয়—এবং মিশানো বীজ কখনও খোলা রৌদ্রে রাখিতে নাই, ঐ জন্য বিকালের দিকে বারসীম বীজ বুনিবার ভাল সময়। রিহজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়াল কালচার মিশাইয়া বুনিলে ফলন দেড় থেকে দুইগুন বাড়ে বীজ ছিটাইয়া বুনুন। বীঘা প্রতি বীজের পরিমান ২½ ৩ কিলো। বীজ বিকালে বুনিবেন, বীজ ছিটাইয়া বুনিবার সময় সতর্ক থাকিবেন যেন বীজ সমহারে ছড়ানো হয়। বীজের সঙ্গে মাটি গুড়িয়ে সমপরিমানে মিশিয়ে নিলে বীজ বোনাতে বা ছিটানোতে সমতা বজায় রাখা অনেকটা নিঃশ্চিত করা যায়। পরের দিন লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন কোথাও যদি বীজ না পড়িয়া থাকে বা কম পড়িয়া থাকে তবে সেখানে বীজ ছড়াইয়া দিবেন। উপযুক্তভাবে বোনা বীজ যদি দাঁড় করানো জলে কয়েক ঘন্টা ভিজিতে পারে তবে ৩৬ ঘন্টার মধ্যে অংকুরোদগম হইয়া যাইবে। বারসীম বীজের অংকুর খুবই সরু ও নরম এবং অনুকুল পরিস্থিতিতে মাটি ধরিয়া নিতে পারে। অতি খরায় পড়িয়া গেলে কিছু কিছু অংকুর মাটি ধরিতে পারেনা ফলে মরিয়া যায়। বারসীম চাষ অতি সাবধানতার সহিত করা উচিত। জমি তৈরীর সময় জমির উঁচু নীচু ও অতি সাধারণ ঢালুকেও বিবেচনায় রাখিতে হয় কেননা সেচের জল সমভাবে ধরিয়া জমি ভিজাইয়া রাখা সম্ভব হয়। বীজ ছড়াইবার সময় অধিক সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয় কেননা অসম, উঁচুনীচু জায়গার নীচু জায়গায় অধিক বীজ পড়িলে অতি ঘন হইয়া অংকুর বাহির হইবে আবার তুলনামূলক উঁচু জায়গায় কম বীজ পড়ায় অংকুর বাহির হইলনা বা কম বীজ বাহির হইল, এর কোন অবস্থাই বারসীম

চাষে কাম্য নহে, এর যে কোন কারণই ঘটুক না কেন ফলন অতি মাত্রায় কমিয়া যাইবে কেননা এমন চাষে জমি বীজ, সার ও সেচের সমন্বয় ঘটানো হয়নি। সঠিক ফলন পাইতে সঠিক চাষ হওয়া দরকার। ফসল বুনিবার ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে একটি হালকা সেচ দিয়া দিতে হয়। সেচ দিবার ঠিক আগে গাছ যখন ২-২½ ইঞ্চি হইয়া যায় তখন বারসীম চারা ছাঁটিয়া সঙ্গে সঙ্গে সেচ দিয়া দিতে হয়। একমাস পরে আরো একটি সেচ দিয়া দিন।

কি করিয়া ফলন লইতে হয়—৫০-৬০ দিনের মধ্যে গাছ ১ফিটেরও বেশী উঁচু হয় এবং প্রথম কাটিং নিবার উপযুক্ত হয়। তারপর প্রতি মাসে একবার করিয়া সেচ দিয়া দিন। কাটিং নিবার আনুমানিক দশ দিন আগে সেচ দিয়া দিলে ঐ সেচেই পরবর্তী কাটিংএর জন্য ফসল বাড়ন নিবে। ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে আবার কাটিং নিতে পারিবেন। এমন করিয়া অগ্রহায়ণ হইতে বৈশাখ পর্যন্ত ৫/৬ বার কাটিং নেওয়া সম্ভব হয়। মাটি থেকে ১½-২ ইঞ্চি পরিমান ছাড়িয়া দিয়া ঘাস কাটিয়া লইনে হয় ইহাতে পরবর্তী বাড়ন নিতে গাছের সুবিধা হয়। গড়ে বিঘা প্রতি ফসল দাঁড়াইবে প্রায় ৫০ কুইন্টাল। সেপ্টেম্বরে বোনা ফসলের প্রথম কাটিং পাইবেন নভেম্বরে সাধারণত শীতের ফসল ওটস, মটর শুঁটি ইত্যাদির ফলন এতো তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় না। তাছাড়া এই ঘাস চলতে থাকবে জৈষ্ঠ্য মাস পর্যন্ত, এবং ঠিক ঐ সময়ের মধ্যে কোনও খরিপ ফসল বরবটি ভুট্টা ইতাদিরও ফলন নিবার অবস্থায় আসেনা।

বারসীম ঘাসের শিকড়ে নাইফাহিং ব্যাকটেরিয়া প্রচুর শুঁটি জন্মায় ইহাতে মাটিতে পরবর্তী ফসলের জন্য নাইট্রোজেন প্রচুর পরিমাণ থাকিয়া যায়। এই শুটিযুক্ত শিকড় মাটিতে বিঘা প্রতি প্রায় ২০ থেকে ৩০ কে.জি, নাইট্রোজেন জমিতে যুক্ত করে অথাৎ প্রায় ১০০—১৫০ কে.জি. এমোনিয়াম সালফেটের সমান দাঁড়ায়। ভাল ফসলের বারসীম ঘাসের জমিতে পরবর্তী ফসলের জন্য এ্যাসোনিয়াম সালফেট বা ইউরিয়া না দিলেও চলে। ফসল বিশেষে অল্প এ্যামোনিয়াম সালফেট প্রয়োগ করিলেই ভাল ফসল জন্মানো যায়। বারসীম চাষের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদার ইহাও অন্যতম কারণ।

লুসার্ন—১১

লুসার্ন ঘাস পশ্চিম বাংলার আবহাওয়ায় শীতকালিন ঘাস হিসাবেই জন্মায় কারণ এই ঘাস অধিক গরম বা বৃষ্টি সহ্য করিতে পারে না। শীত প্রধান দেশে বারমেসে ঘাস হিসাবে এর চাষ হয়। লুসার্ন ঘাস প্রায় সব রকম মাটিতেই জন্মায়। বেলে-দোঁয়াশ থেকে আরম্ভ করিয়া দোঁয়াশ, এঁটেল দোঁয়াশ এমনকি এঁটেল মাটিতেও জন্মানো যায়। তবে চুনযুক্ত দোঁয়াশ মাটি যাহা ক্ষারত্ব বা অম্লত্বের দিকে ঝুঁকিয়া নাই এমন জমি ভাল জল নিস্কাশনের ব্যাবস্থাযুক্ত হইলে লুসার্ন চাষের সবচেয়ে উপযোগী। এই ফসলে সেচ অবশ্য প্রয়োজনীয়। বুনিবার ১৫ দিন পরে প্রথম সেচ দিতে হয় তারপর ১ মাস পরে পরে সেচ দিতে হয় শীতের কয়েক মাস। গ্রীষ্মের সময় সেচ দিতে হয় প্রতি ১৫ দিন অন্তর। যদি জমিতে প্রচুর পরিমানে রস থাকে তাহলে সেচ আরো দেরী করিয়া দিলেও চলে লুসার্ন ঘাস ও বারসীম ঘাসের চাষ প্রায় একই রকম কেবল লুসার্ন ঘাসে দু একটি সেচ বেশী দরকার হয়। তাই ঘাস উৎপাদনের ব্যয় বারসীম ঘাসের চাইতে লুসার্ন ঘাসে কিছু বেশী হয়। ফলন হয় প্রায় একই রকম। পশ্চিম বাংলায় বারসীম চাষ যেমন দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে লুসার্ন ঘাসের চাষ কিন্তু সেরূপ বাড়িতেছে না। এর কারণ হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, লুসার্ন ঘাসের বীজ সংগ্রহ ও সরবরাহ কোন বীজ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান করে না বা অর্ডার হইলেও করিতে চাহে না। কারণ লুসার্ন বীজ বারসীম বীজ হইতে দামী ও উত্তর পশ্চিম ভারতের বিশেষ অঞ্চল ছাড়া কোথাও হইতে সংগ্রহ করা যায় না।

কখন লাগাইতে হয়—কার্তিক মাসের শেষ বা অগ্রহায়নের প্রথম হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত লুসার্ন বীজ বোনা চলে। যত পরে বুনিবেন কাটিংসও তত কম পাইবেন।

কি করিয়া জমি তৈরী করিতে হয়—বেলে মাটিতে লুসার্ন চাষ হয়না

বটে কিন্তু বেলে দোঁয়াশ মাটিতে লুসার্ন চাষ সম্ভব হয়। দোঁয়াশ মাটি সব চাইতে ভাল। এঁটেল দোঁয়াশ মাটিতেও বোনা চলে। চুন ফসফরাস, ক্যালসিয়াম ও সালফেট আছে এমন জমিতে লুসার্ন চাষ ভাল হয়। অম্লযুক্ত মাটিতে চুন দিয়া দিন। ক্ষারযুক্ত মাটিতে স্বভাবতই লৌহ কম থাকে। বালু মাটিতে পটাশের প্রয়োজন হয়। জল নিস্কাসন যুক্ত উচু জমি বারসীম চাষের উপযোগী। ৬-৮ চাষ ও মই দিয়া জমি একেবারে সমান করিয়া তৈরী করুন। জমি তৈরী করিবার সময় জমিতে ১২-১৫ কুইন্টাল গোবর সার ও ২৫-৩০ কে. জি. সুফার ফসফেট বিঘা প্রতি দিয়া দিন তাতে গাছের শিকড়ে নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়ার কাজ ভাল হইবে। লুসার্নের শিকড় অনেকটা মাটির তলায় চলিয়া যায় ও শিকড়ে অধিক পরিমানে নাইট্রোজেন নডিউল তৈরী হয় বলিয়া জমি প্রস্তুতি করণ খুবই সুষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন।

কি করিয়া বুনিতে হয়—বারসীম চাষের মতোই লুসার্ন বীজ (রিহজো-বিয়াম ট্রিকলি) ব্যাকটোরিয়াল কালবার মিশাইয়া বুনিতে হয়। তৈরী করা জমিতে হাত আইল ধরাইয়া দিয়া হালকা সেচে ভিজাইয়া দিন যাতে ১ ইঞ্চি পরিমান জল দাঁড়ায়। এইবার বীজ ছিটাইয়া বুনুন। হালকা করে বীজ ছড়াইবেন। আইলের পাশে পাশে হাটিয়া বীজ ছড়াইবেন আর লক্ষ্য রাখিবেন যেন সমান ভাবে বীজ ছড়ায়। ৮-১০ ঘন্টাম মধ্যেই যেন জমির জল টানিয়া যায়। বিকালের দিকে বীজ বুনিবেন। বিঘা প্রতি বীজ লাগিবে ২-৩ কে. জি.। বীজ লাগানোর পরে পরে লক্ষ্য করুন কোথায় কোথায় বীজ পড়েনি, তেমন জায়গাগুলিতে কিছু কিছু বীজ ছিটাইয়া শুন্য যায়গা ভরিয়া দিন ফলে সমভাবে জমিতে অংকুর উদগম হইবে ।

কি করিয়া ফলন লইতে হয়—চারা ২-৩ ইঞ্চি হইলে একবার সেচ দিয়া দিন। এমন সাইজের চারা হইতে প্রায় ৩ সপ্তাহ সময় লাগিবে। তৃতীয় সেচ দিবেন আবার ১ মাস পরে মানে বুনিবার ৫৫-৬০ দিনের মধ্যে। ৮০ দিনে ঘাস প্রথম কাটিবার উপযোগী হইবে। ৮০-৯০ দিনের মধ্যে কাটিংস নিয়া সঙ্গে সঙ্গে সেচ দিয়া দিন। ঠিক মতো যত্ন লইলে ৩০ দিন পরে আবার কাটিংস লইতে পারিবেন। প্রতি কাটিংস নিবার সময় মাটি হইতে দেড়-দুই ইঞ্চি পরিমান ছাড়িয়া ঘাস কাটিয়া লইতে হয় ইহাতে গাছের পরবর্তী বাড়ন তাড়াতাড়ি আসে। প্রতি কাটিংস নিবার পরই সেচ দিয়া দিবেন। খুব গরম না পড়া অবধি এমনভাবে কাটিংস নিতে থাকিবেন এবং প্রতি কাটিংস নিবার পর

সেচ দিয়া দিলে বৈশাখ মাস অবধি ফলন পাবেন। বিঘা প্রতি ফলন দাঁড়াইবে প্রায় ৬০ কুইন্টাল। লুসার্ণ ঘাস বারসীম ঘাসের চাইতেও উপাদেয় ও পুষ্টিকর। লুসার্ণ ঘাসে কচি অবস্থায় প্রোটিন থাকে শতকরা ১৬-১ ভাগ, ফসফরাস ০.৭২ ভাগ, ক্যালসিয়াম ৩.৪৯ ভাগ ও পটাশিয়াম থাকে শতকরা ৪.৫৫ ভাগ। ফুল হইবার আগে থাকে প্রোটিন ১৩.৩১ ভাগ, ফসফরাস ০.৩৮ ভাগ, ক্যালসিয়াম ২.৪৮ ভাগ, ও পটাশিয়াম থাকে শতকরা ২.২১ ভাগ। ফসল পাকিলে লুসার্ন ঘাসে থাকে প্রোটিন শতকরা ১১.৩১ ভাগ, ফসফরাস ৩.৩০ ভাগ, ক্যালসিয়াম ১.৭২ ভাগ এবং পটাশিয়াম থাকে শতকরা ৩ ৩৫ ভাগ। ইহা উচ্চ প্রোটিন সম্পূর্ণ হওয়ায়, এককভাবে ইহা গবাদি পশুকে খাওয়ানো উচিত নহে। প্রাথমিক অবস্থায় পেট ভরানো খাদ্যের সহিত ২ কেজির বেশী লুসার্ন ঘাস প্রতি গাভীকে দেওয়া উচিত নহে। বেশী খাইলে গরুর পেট ফাঁপা রোগ দেখা দিতে পারে। এইজন্যে ক্রমান্বয়ে সহনশীল করিয়া ইহার মাত্রা বাড়ানো উচিত। এবং বাড়িয়ে বাড়িয়ে ৩-১ হারে লুসার্ন ঘাসে ও খড়ে মিশ্রণ ঘটাইয়া দৈনিক পেট ভরানোর খাদ্য হিসাবে দিলে, সুষম খাদ্য না দিলে বা কম দিলেও চলে কারণ লুসার্ন ঘাসে সাধারণত ১৫-২০ ভাগ প্রোটিন থাকে যখন গাছ ফুল বের করিবার অবস্থায় আসে। কিন্তু সমস্ত ফুল বাহির হইবার পর প্রোটিন শতকরা ১২-১০ ভাগে নামিয়া আসে। সুতরাং ফুল আসিবার মুখেই লুসার্ন ঘাস কেটে নেওয়া লাভ জনক। লুসার্ন ঘাসের পাতায় $\frac{8}{5}$ অংশ প্রোটিন থাকে। লুসার্ন ঘাস কাটিবার পরে লক্ষ্য রাখিতে হইবে পাতা যেন অল্প শুষ্কতায় ঝরিয়া না পড়ে। লুসার্ন ঘাসে প্রচুর পরিমানে ক্যালসিয়াম আছে কিন্তু ফসফরাস তুলনা মূলক অনেক কম আছে।

ওটস্—১২

ওটস্ শীতকালীন একমাত্র একপত্রবীজ শষ্য জাতীয় ফসল। বাকী শীতকালীন অন্যান্ন সব ঘাসই ডাল, কলাই বা শুঁটি জাতীয়। গোখাদ্য ঘাস হিসাবে সরকারী খামারগুলিতে এই ঘাসের চাষ আগেও ছিল। কয়েক বছর হইতে পশুখাদ্যের জন্য ওট্স ঘাসের চাষ বাংলায় ব্যপকভাবে শুরু হয়। চাষীভাই ও গোপালকদের নিকট এই ঘাসের কদর দিন দিন বাড়িতেছে। ইহার চাষ পদ্ধতি ও ব্যবহার সম্বন্ধে বাংলার গোপালকদের সম্যক জ্ঞান রহিয়াছে। ওটস্ ঘাসের চাহিদা দিন দিনই বাড়িয়া চলিতেছে। দুগ্ধবতী গবাদি পশুর জন্য ওটস্ ঘাস যেমন উপাদেয় তেমনি পুষ্টিকর ও তুলনামূলকভাবে অল্প ব্যায়েরও বটে। বারসীম একক খাওয়াইলে পাতলা গোবর হয় বলিয়া বারসীম ঘাসের সহিত খড় বিচালি কুচিয়ে গরু মোষকে খাওয়াইবার রেওয়াজ চালু রহিয়াছে। দেখা গিয়াছে ওট্স ঘাসের সহিত বারসীম ঘাস মিশাইয়া বুনিলে, ও একই সঙ্গে কাটিয়া খাওয়াইলে পাতলা গোবর হয় না পরন্তু মুখোরোচক হয় এবং পুষ্টিও অনেক বাড়িয়া যায়। ওটস্ এর একক ফলনও অর্থকরী এবং বারসীম, লুসানের সহিত তুলনানামূলক ভাবে চাষ পদ্ধতি অনেক সহজ ও নিশ্চিত। তাই শীতকালীন ওটস্ ঘাসের চাষ এত তাড়াতাড়ি পরিচিতি লাভ করিয়াছে। বারসীম, লুসানে'র মতো ওটস্ ঘাসে সেচের দরকার হয় না, তাই উৎপাদন ব্যয় তুলনামূক কম।

কখন লাগাইতে হয়—কার্তিক মাস হইতেই ওটস্ বোনা চলিতে পারে, অগ্রহায়ন মাসের শেষ অবধি এমনকি পৌষের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত। তবে বারসীমের সহিত মিশিয়ে বুনিতে হইলে বারসীম বুনিবার অন্তত ১৫ দিন আগে ওটস্ বুনিয়া দিন। দ্বিতীয় সপ্তাহে সেচ দিয়া ওটস্ মাঠেই বারসীম বীজ ছড়াইয়া দিন।

কি করিয়া জমি তৈরী করিতে হয়—সাধারণত সকল ধরনের মাটিতেই

এই ঘাস জম্মনো যায় কেবলমাত্র বালীমাটি ক্ষারযুক্ত জমি ছাড়া। যেসব মাটিতে গম, বার্লি ইত্যাদি ভাল জম্মায় তেমন মাটিতেও ওটস্ ঘাস ভাল জম্মায়। এ‍ঁটেল দোঁয়াশ বা দোঁয়াশ মাটিই ওটস্ চাষের উপযোগী। ৫-৬ চাষ ও মই দিয়া জমি তৈরী করিয়া নিন। শেষ চাষ ও মই দিবার আগে একটি হালকা সেচ দিয়া দিন তাতে ক'রে শেষের চাষ ও মইতে জমি খুব ভাল তৈরী হইবে, এবং মাটিতে খুব ভালো জোঁ থাকিবে যার ফলে বোনা বীজ সম্পূর্ণ ভালভাবে বাহির হইয়া আসিবে। জমি তৈরী কয়িবার সময় ১২-১৫ কুইন্টাল গোবর সার বিঘা প্রতি দিন। শেষ চাষ দিবার সময় বিঘা প্রতি ১৫ কে জি এ্যামোনিয়াম সালফেট দিয়া দিবেন। যদি ওটস্ এর সহিত পরে বারসীম মিশাইয়া বুনিতে চান। তবে ২৫ কে. জি পরিমান সুপার ফসফেট ২-৩ চাষের সময়ই জমিতে দিয়া দিবেন!

কি করিয়া বুনিতে হয়—ছিটাইয়া বুনুন। লাইনেও বোনা যায়। তবে ছিটাইয়া বোনাই ভাল। বিঘা প্রতি বীজের পরিমান ৮-১০ কে জি। যদি বারসীম মিশাইয়া বুনিতে চান তবে বীজের পরিমান কমাইয়া বিঘা প্রতি ৫-৬ কে জি দিয়া বুনুন। দেড় দুই সপ্তাহ বাদে যখন ওটস্ ঘাস প্রায় ২ ইঞ্চি পরিমান দাঁড়ায় তখন হাল্কা সেচ দিয়া জমিতে প্রায় আধ ইঞ্চি পরিমানে জল দাড় করাইয়া নিন এবং বারসীম বুনিয়া দিন। বারসীম বীজ বিঘা প্রতি দেড় দুই কে, জি, ওর মধ্যেই ছিটাইয়া বুনিয়া দিন। এইভাবে বুলিলে দেখা যাইবে আরো ৩ সপ্তাহ বাদে বারসীম ঘাস প্রার আড়াই তিন ইঞ্চি হইয়া গিয়াছে। তখন ওটস্ দাঁড়াইয়া যাইবে ১২ ইঞ্চি বা তার বেশী। এই সময়ে ওটস্ ঘাসের একটি কাটিং নিয়া নিন ফলে বারসীম ফলের ডগাগুলিও কাটা পড়িয়া যাইবে। এবার সেচ দিয়া দিন। দুই সপ্তাহের মধ্যে বারসীম ঘাস লাফিয়ে বড় হইয়া উঠিবে এবং ওটস্ ঘাসের র‍্যাটুনও বাহির হইয়া আসিবে এবং দুই ঘাসের উচ্চতা প্রায় সমান সমান হইয়া যাইবে।

কি করিয়া ফসল লইতে হয়—ওটস্ এককভাবে বুনিলে চার থেকে পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে একবার সেচ দিয়া দিন। আট থেকে নয় সপ্তাহের মধ্যেই একবার কাটিয়া নিতে পারেন। মাটি হইতে ২—২½ ইঞ্চি ছাড়িয়া কাটিবেন। বিঘা প্রতি ৮—১০ কে.জি. এ্যামোনিয়াম সালফেট ছিটাইয়া সেচ দিয়া দিন। গাছ আবার বাড়িতে আরম্ভ করিবে। গাছ যখন ফুল বাহির করিবার পর্য্যায়ে আসিবে আবার কাটিয়া নিন। এ পর্য্যায়ে আসিতে সময়……সপ্তা সময় লাগিবে আট থেকে নয় সপ্তাহ। যদি বীজ সংগ্রহ করিতে চান

তবে এই ফুল আসা অবস্থার গাছ না কাটিয়া একবার সেচ দিয়া দিন। চৈত্র মাসের শেষ হইতে বৈশাখের মাঝামাঝিতেই আপনি ফলন পাইয়া যাইবেন। ঘাস হিসাবে প্রথম কাটিংস পাইবেন ১৬-১৮ কুইন্টাল, দ্বিতীয় কাটিংস পাইবেন ১০-১২ কুইন্টাল, মোট প্রায় ৩০ কুইন্টাল। আর যদি বীজ নেন তবে প্রায় ১½-২ কুইন্টাল বীজ পাইবেন। যদি কাটি্স মোটেই না নেওয়া হয় তবে ২-২½ কুইন্টাল বীজ পাওয়া যাইবে। বীজের জন্য বিশেষ যত্ন লইয়া চাষ করিলে অরো অধিক ফলন পাওয়া যাইবে। ওটস্ ঘাসে কাঁচ অবস্থায় থাকে শতকরা ১২.১৮ ভাগ প্রোটিন, ০·৬৬ ভাগ ক্যালসিয়াম, ০·৬৩ ডাগ ফসফরাস ও ৬·০৬ ভাগ পটাশিয়াম। ফ্ল আসিবার আগে থাকে শতকরা ৬·১২ ভাগ প্রোটিন, ০·৬১ ভাগ ক্যালসিয়াম, ০·৮৪ ভাগ ফসফরাস এবং ৩·৮৪ ভাগ পটাসিয়াম। ফসল পাকিলে ওট্স গাছে থাকে শতকরা ৫·৯২ ভাগ প্রোটিন, ০·৭১ ভাগ ক্যালসিয়াম, ০·৫৯ ভাগ ফসফরাস এবং শতকরা ২·৮১ ভাগ পটাসিয়াম।

এক নজরে কোন ঘাস কখন বোনে, কত বীজ লাগে কত সেচ ও সার লাগে

ফসলের নাম	কখন বোনে	বিঘা প্রতি কতো বীজ লাগে	কত সার লাগে	কবার সেচ লাগে
১	২	৩	৪	৫
হাইব্রীড নেপিয়ার	ফাল্গুন থেকে বৈশাখ	তিন থেকে চার হাজার কাটিংস	২০-২৫ কুঃ গোবর সার। প্রতি কাটিংস নেবার পর ৮-১০ কে.জি. এ্যাঃ সালফ্	শীতের সময় ২ বার, খরায় পড়লে এক দুবার
টিওসিনটি	বৈশাখ থেকে ভাদ্র	৫-৬ কে.জি.	২০-২৫ কুঃ গোবর সার। ২০ কেঃ এ্যাঃ সাঃ (২ বারে)	প্রথম কাটিংস নেবার পর যদি খরা থাকে তবে ১ বার সেচ দিন
ভুট্টা	জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়	৭-৮ কে.জি.	১২-১৫ কুঃ গোবর সার ২৫ কে এ্যাঃসালফ্ ২ বারে ১২-১৫ কেঃ সুঃ ফস্ঃ	খরিপখন্দে দরকার হয় না, খুব খরায় পড়লে ১ বার
জোয়ার	বৈশাখ থেকে শ্রাবণ	৫-৬ কে.জি.	১০-১২ কুঃ গোবর সার ২৫-৩০ কেঃ এ্যাঃ সালফ্ ২ বারে	সেচ দরকার হয় না

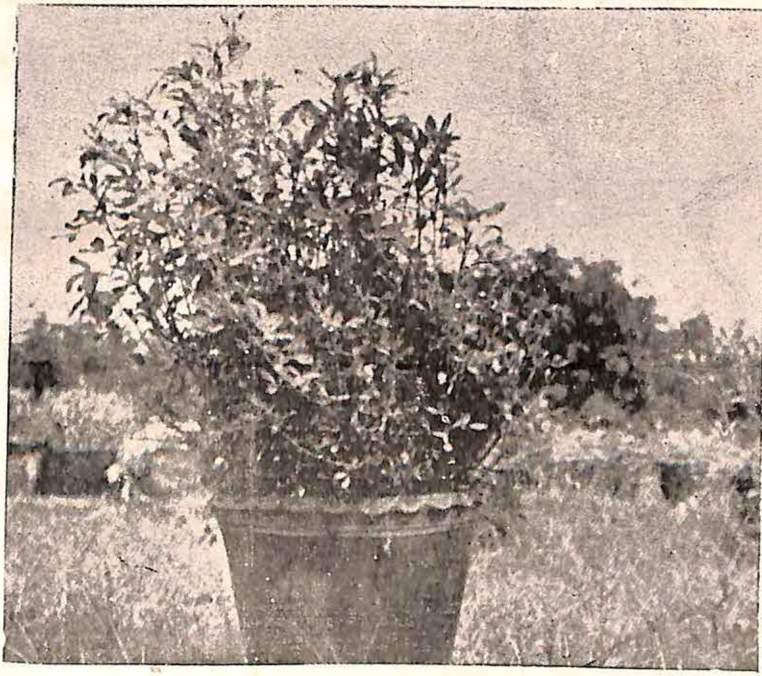
ফ্যাঃ ক্যাল (রাইস-বীন) গাইমুগ	জ্যৈষ্ঠ থেকে ভাদ্র	৩-৪ কে.জি.	১০-১২ কুঃ	গোবর সার	সেচ দরকার হয় না
ফ্যাঃ অরিয়ন্ত (ট্রেটাকলাই)	জ্যৈষ্ঠ থেকে ভাদ্র	৪ কে.জি.	১০-১২ কুঃ	গোবর সার	সেচ দরকার হয় না
কাউপি (বরবটি)	বৈশাখ থেকে আষাঢ়	৪ কে.জি.	১০-১২ কুঃ	গোবর সার	সেচ দরকার হয় না
মটরশুঁটি	কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ	৭-৮ কে.জি.	১০-১২ কুঃ ২৫-৩০ কেঃ	গোবর সার সুঃ ফস ঃ	সেচ দরকার হয় না
বারসীম	কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ	৩-৩½ কে.জি.	৮-১০ কুঃ ২৫-৩০ কেঃ	গোবর সার সুঃ ফসঃ	প্রতি কাটিংস এর পর ৯ সেচ মোট—৫-৬ সেচ।
লুসার্ন	কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ	৩½ কে.জি.	৮-১০ কুঃ ২৫-৩০ কেঃ	গোবর সার সুঃ ফসঃ	প্রতি কাটিংস এর পর ৯ সেচ মোট—৬-৭ সেচ।
ওটস্	কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ	৮-১০ কে.জি.	১০-১২ কুঃ ১২-১৫ কেঃ প্রতি কাটিংস নেবার পর ৭-৮ কেঃ এ্যাঃ সালফ্	গোবর সার এ্যা সালফ্	কাটিং নেবার পর সেচ দরকার

সয়াবীন

সয়াবীন উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ এবং আদ্র আবহাওয়ায় ভাল জন্মায়। জল নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা আছে এমন দোঁআঁশ মাটিতে ভাল জন্মায়। এঁটেল-দোআঁশ মাটি সয়াবীন উৎপাদনের উপযোগী। অল্প বৃষ্টি পেলেই গাছ জন্মায় তবে জল দাঁড়াইয়া যাওয়া অবস্থা বা ক্ষরা মোটেই সহ্য করিতে পারে না। সয়াবীন বোনার সময় বীজ নাইফ্রাইং ব্যাকটেরিয়াল কালচারের সহিত মিশাইয়া বুনিলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। ভাল ফলন পাওয়ার জন্য বীজ বুনিবার সময় বিঘা প্রতি ১০ কিলো এমোনিয়াম্ সালফেট ও ২০ কিলো সুপার ফস্‌ফেট দিয়া বুনিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। লাইনে লাইনে দেড় হাত ও বীজ থেকে বীজ ২—২½" ব্যবধানে চাষ করা উচিত এবং বীজ যেন ১ ইঞ্চির বেশী মাটির তলায় না যায়। বীজের জন্য ফলন নিতে হইলে বিঘা প্রতি বীজ বুনিতে হয় দুই কিলো এবং লাইনে বুনিতে হয়। আর ঘাসের জন্য দ্বিগুণ হারে বা আরও বেশী বীজ দিয়া ঘন করিয়া ছিটাইয়া বুনিতে হয়। বীজ ফলন হিসাবে নিতে হয় যখন সয়াবীন গাছের পাতা হলদে হইয়া আসে এবং বীজের ছড়ার রং যখন হলদে হইতে গাঢ় বাদামী রং হইয়া আসে। সয়াবীন চাষে মোট সময় নেয় প্রায় তিন মাস বা তারও কিছু কম। কিন্তু ঘাস হিসাবে ফলন দুই মাসের মাথায়ই নেওয়া চলে। ঘাস হিসাবে সয়াবীন তুলনামূলকভাবে বরবটীর চাইতে ভাল না হইলেও ইহা সকল বয়সের গবাদি পশুকে খাওয়ানো চলে। ভুট্টা ঘাসের সহিত মিশাইয়াও খাওয়ানো চলে। সয়াবীনের দানায় সুপাচ্য আমীষ উপাদান বেশী থাকায় এবং স্নেহজাতীয় পদার্থ বেশী থাকায় উহা কখনো কখনো কোন কোন গবাদি পশুকে খাওয়াইলে খুবই ভাল ফল পাওয়া যায়।



বারসীম



লুসার্ন

(গুয়ারা)

ক্লাসটারবীন

গুয়ারা ঘাস ভারতের সর্বাঞ্চলেই হয়। এই ঘাস দুই হইতে তিন হাত লম্বা হয়। ফলের ছড়া ১ থেকে প্রায় ৫ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হইতে পারে এবং প্রতিটি ছড়ায় ৫-১২ টি পর্যন্ত বীজ হইতে পারে।

গুয়ারা ঘাস মোটামুটি দোঁয়াশ মাটিতে জন্মে। মাটিতে জল দাঁড়ানো অবস্থা অথবা ম্যাটি খুব বেশী ভেজা অবস্থা সহ্য করিতে পারেনা কিন্তু খরা সহ্য করিতে পারে। গবাদি পশুর খাদ্য ঘাস হিসাবে খরিপে চাষ হয় এবং ফসল বুনিবার পরে খুব একটা পরিচর্যায় প্রয়োজন হয় না। চৈত্র বৈশাখ মাসে ১০-১২ কুইন্টাল গোবর সার দিয়া ভাল করিয়া জমি তৈরী করিয়া লইতে হয়। এবং বিঘা প্রতি ৪ কিলো বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। বৃষ্টির প্রথম মরশুমে এবং জৈষ্ঠ মাসেও বোনা চলে। বর্ষার শেষের দিকে এবং ভাদ্র মাসেও বোনা যায়। ঘাসের জন্য গুয়ারা জোয়ার ঘাসের সহিত মিশাইয়া বোনা চলে। গাছ বুনিবার ১½—২ মাসের ভিতরই ফল বাহির হইতে শুরু করে। বিঘা প্রতি ঘাসের ফলন পাওয়া যায় প্রায় ১২ কুইন্টাল বা তারও বেশী এবং বীজ পাওয়া যায় প্রায় ১ কুইন্টাল, বা তাঁরও বেশী। প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাত অথবা সেচ পাইলে ফলন আরো বাড়ে। গুয়ারা ঘাস গবাদি পশুর পক্ষে উপাদেয় ও পুষ্টিকর।

মেথী—

ভারতের প্রায় সর্বত্রই জন্মায়। হালকা মাটি খুব ভাল জল নিস্কাসন যুক্ত হইলে মেথী সহজে জন্মানো যায়। বৃষ্টির জল অথবা সেচ পর্যাপ্ত থাকিলে হালকা মাটিতে ভাল ফসল জন্নানো সম্ভব। জমি তৈরী করিবার সময়ে বিঘা প্রতি ২০ কুইন্টাল গোবর সার দিয়া দিন। বিঘা প্রতি ৩-৪ কিলো বীজ ছিটাইয়া বুনুন। আশ্বিন কার্তিক মাসেই বুনিবার উপযুক্ত সময়। ২৫ হাত লম্বা ও ৩ হাত চওড়া বীজ তলা খুব ভাল করিয়া তৈরী করিয়া বিঘা প্রতি ৩-৪ কিলো হিসাবে বীজ দিয়া ভালভাবে ছিটাইয়া বুনিবার পর হালকা করিয়া

মাটি ঢাকা দিয়া জল দিয়া ভিজাইয়া দিন। ১৫ দিনের ভেতর আর একবার বীজ তলা ভিজাইয়া দিন। তৃতীয় সপ্তাহের মাথায় আবার জল দিয়া দিন। তারপর প্রতি ১৫ দিনে একবার করিয়া সেচ দিয়া দিন। ঘাসের জন্য মেথী জন্মাতে মোট প্রায় ছয়বার সেচ দেওয়া দরকার হয়। যদি ফলনের জন্য রাখিতে হয় তবে আর দুটো সেচের প্রয়োজন হয়। মেথীর এবং লুসার্ণের শিকড়ে একই ধরনের ব্যাকটেরিয়াল নডিউল হয়। সুতরাং যে মাঠে পূর্ববর্তী ফসল লুসার্ণের চাষ হইয়াছিল সেখানে মেথী বুনিলে বীজকে রাইজোবিয়াম নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া মেশানোর প্রয়োজন হয় না অথবা যে মাঠে মেথীর চাষ হইয়াছিল সেখানে লুসার্ণের চাষে রাইজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়া মেশানোর দরকার হয় না।

বিঘা প্রতি মেথী ঘাসের ফলন হয় ১০-১২ কুইন্টাল। দুইমাস পরেই প্রথম কাটিং নেওয়া যায় এবং পরে প্রতি ৩ সপ্তাহ পর পর কাটিং নেওয়া চলে। মেথী লুসার্ণ ঘাসের সহিত মিশাইয়া বোনা চলে। কলাই-এর সহিত মিশাইয়াও মেথী বোনা চলে। ১ বিঘা জমির ফলন ৩টি গাভী প্রায় ১ মাস পর্যন্ত খাইতে পারে।

মুগ—

এঁটেল মাটিতে জন্মায়, খরা সহ্য করিতে পারে। বিঘা প্রতি ৩ কিলো বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে বোনা হয়, ফাল্গুন মাসে ফসল তোলা হয়। ঘাসের জন্য মুগ, এবং বরবটি ধইঞ্চার সহিত মিশাইয়া বোনা চলে। এককভাবে মুগ ভাদ্র মাসের পর হইতেই ঘাসের জন্য বোনা চলে কেননা অল্পদিনেই ঘাস বড় হয় এবং গবাদি পশুকে খাওয়ানো চলে। বিঘা প্রতি মুগের ফলন ৩৫-৪০ কিলো হয়। এবং ভুষা হয় প্রায় ৭০—৭৬ কে, জি। গবাদি পশু খাদ্যে মুগের ভুষী খুবই উপাদেয়।

খেসারী—

এঁটেল ভেজা মাটিতে ভাল জন্মায়। সাধারণত দুই বা তিন চাষ দিয়া বুনিতে হয় যদি মাটি যথেষ্ট পরিমানে ভিজা থাকে তবে চাষ না দিয়াও আশ্বিন কার্তিক মাসে দাঁড়ানো ধানের ফসলের মধ্যেই বিঘা প্রতি ৩ কিলো বীজ

ছিটাইয়া বোনাও চলে। এমন অবস্থায় বোনার পরে আর কোনও পরিচর্য্যার দরকার হয় না। সাধারনত ৬০ দিনের মধ্যে ঘাস খাওয়ানোর উপযোগী হয় এবং পর্যাপ্ত ঘাস জন্মায়। ফসল পাকিতে প্রায় ৯০ দিন সময় লাগে। বিঘা প্রতি বীজ জন্মায় প্রায় ৪০ কিলো আর ভুষা হয় প্রায় ১০০ কিলো। খেসারী ভুষা একটি উৎকৃষ্ট গোখাদ্য। চরিয়ে খাওয়াইবার জন্য খেসারী ঘাস বিশেষ উপযোগী। ফলনও হয় প্রচুর। অগ্রহায়ণ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্যন্ত এই ঘাস চারনভূমিতে রাখা সম্ভব। বুনিবার মুখেই এগিয়ে বোনা অথবা পিছাইয়া বোনার উপরেই নির্ভর করিবে এর ফলন নেবার সময়কাল। বোনার পরে প্রতি দুমাসে এই ঘাস চরানোর উপযোগী হয়। বাঙলায় গবাদি পশুখাদ্যের জন্য খেসারীর চাষ অনেক আগে হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং খেসারীর চাষ বাঙলার চাষীভাইদের খুবই পরিচিত।

ছোলা—

ছোলা চাষের জন্য বাংলার পলিমাটি সব চাইতে উপযোগী। ছোলা গাছের বাড়ন্ত সময়ে বৃষ্টি মোটেই সহ্য হয় না। কিন্তু ঠান্ডা মেঘমুক্ত রাতের আকাশ ছোলার বাড়ণকে সাহায্য করে। আশ্বিন কার্তিক মাসে ৩ চাষে জমি তৈরী করিয়া বিঘা প্রতি ৪ কে. জি. বীজ লাইনে অথবা ছড়াইয়া বুনিয়া দিতে হয়। পরবর্তী পরিচর্যার খুব বেশী দরকার হয় না। ৩—৩½ মাসে ফলন পাকিয়া যায়! মাঘ ফাল্গুন মাসে ফসল উঠে। বিঘা প্রতি ফলন হয় ১—১½ কুইন্টাল। ছোলার চুনি গবাদি পশুর সুষমখাদ্য প্রস্তুত করিবার জন্য দরকার হয়।

(ধইঞ্চা) শন—

বাংলায় ধইঞ্চার চাষ রবি ফসল হিসাবেই করা হয়। সাধারণতঃ কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে বোনা হয়, ফাল্গুন চৈত্র মাসে ফসল কাটা হয়। আঁশের (পাট) জন্যই এই ফসলের চাষ হয়। কখনো কখনো সবুজ ঘাসের জন্য চাষ করা হয়। কিন্তু সবুজ ঘাসের জন্য চাষ করিলে গাছ এক ফিট হইতে দেড় ফিট হইলেই ঘাসের জন্য উপযুক্ত হয় এমন কচি অবস্থায় থাকাকালীন গবাদি পশুকে খাওয়ান যাইতে পারে। গাছ যতো বড়ো হইবে ততো বেশী আশযুক্ত হইয়া যায় সুতরাং কচি অবস্থায় খাওয়ানোই উচিত।

সাধারণত সবুজ ঘাসের জন্য বিঘা প্রতি উর্দ্ধে ১০ কিলো পর্য্যন্ত বীজ ছিটাইয়া বোনা যায়, নীচে ৩ কিলো পর্য্যন্ত বোনা চলে। ধইঞ্চা খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে এবং খরা সহ্য করিতে পারে। বিঘা প্রতি ঘাসের ফলন প্রায় ২২ কুইন্টাল এবং ভালো কলন হইলে প্রায় ৩০-৩২ কুইন্টাল পর্য্যন্ত হইতে পারে।

বাজরা—

বাজরা চাষ জোয়ার চাষেরই মতন। সাধারণতঃ শস্যদানার জন্য বাজরার চাষ ব্যপকভাবে হয়। কাঁচা ঘাসের জন্যও বাজরার চাষ প্রচুর হয়। এই ঘাসের সাইলেজ তৈরী হয় এবং এই ঘাস শুষ্ক করিয়া রাখাও চলে। বাজরা ঘাস ৩—৪ ফিট পর্য্যন্ত লম্বা হতে পারে। পাতা ১-১½ ইঞ্চি চওড়া ও ৩—৪ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হয় এবং বহু পাতাযুক্ত হয়। জোয়ার ঘাসের চারা ছোট অবস্থায় প্রুসিক ও এসিড (বিষ) থাকায় গবাদি পশুকে খাওয়ানো সম্ভব হয়না, কিন্তু এই ঘাস ফুল আসার আগেও যে কোনও চারা অবস্থায় কাটিয়া গরু বাছুরকে খাওয়ানো চলে। ইহাতে প্রুসিক এসিড (বিষ) থাকে না। একবার কাটিয়া খাওয়ানোর পর উপযুক্ত পরিমাণে সার ও সেচ দিয়া দিলে গাছ আবার বাড়ন নেয় এবং পরবর্তী আর একবার কাটিং নেওয়া সম্ভব হয়। দুইবার কাটিং নিতে হইলে প্রথম কাটিং গাছ বোনার ২-২½ মাসের মধ্যেই কাটিয়া লইতে হয়। দ্বিতীয় বাড়ন নেওয়া গাছে (র‍্যাটুন) জোয়ারের মত বাজরায় সায়ানোজোনেটিক গ্লোকোসাইড বিষ থাকে না। কাজেই নিরাপদে গরু বাছুরকে খাওয়ানো চলে। ভালো ফলনের ৭০—৭৫ দিনে বিঘা প্রতি কাচা ঘাসের ফলন হয় ২০—২৪ কুইন্টাল।

সুদান ঘাস—

ইহা জোয়ার জাতীয় ঘাস কিন্তু প্রজাতিতে ভিন্ন সেই জন্য চরিত্রগত বৈশিষ্টের দিক হইতে সুদাম ঘাস জোয়ার ঘাসেরই অনুরূপ এবং আবাদ প্রণালীও এক, কিন্তু জোয়ার ঘাসের তুলনায় সুদান ঘাস উৎপন্ন করিতে একটু বেশী জল দরকার হয় এবং তাহাতে ফলন অধিক দাঁড়ায়। সুদান ঘাস তাড়াতাড়ি বাড়ে ও খরা সহ্য করিতে পারে। চরিয়ে খাওয়াইবার জন্য, শুকনো ঘাস

তৈরী করিবার জন্য এবং সাইলেজ তৈরী করিয়া রাখিবার জন্য এই ঘাস খুবই উপযোগী। এই ঘাস উষ্ণ আদ্র আবহাওয়ায় যে কোন ধরণের মাটিতে জমানো যায় কিন্তু ক্ষারযুক্ত মাটিতে ও স্যাঁতস্যাতে ভিজা মাটিতে জন্মানো সম্ভব নয়। সুদান ঘাসের বীজ ছোট ঐ জন্য ৩—৪ চাষ ও মই দিয়া জমি খুবই উত্তমভাবে তৈরী করা দরকার। বিঘা প্রতি বীজের পরিমাণ ৩—৪ কিলো। বীজবুনিয়া ঢাকিয়া দিবার সময় মনে রাখা দরকার যেন বীজ মাটির ১ ইঞ্চির মাটি বেশী তলায় না চলিয়া যায়। জমি তৈরীর সময় বিঘা প্রতি ১৫ কুইন্টাল জৈব সার দিয়া জমি তৈরী করুন এবং ভাল ফলনের জন্য বিঘা প্রতি ১২-১৫ কে. জি. অ্যামোনিয়াম সালফেট দুইবারে দিয়া দিতে পারেন, ইহাতে ফলন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। চৈত্র বৈশাখ মাসে প্রথম বৃষ্টিতে ফসল বুনে দেওয়া উচিত, ইহাতে ফলনও গ্রীষ্মের প্রথম দিকেই পাওয়া যায়। চৈত্র বৈশাখ হইতে শ্রাবন ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত এই সুদান ঘাসের চাষ চলিতে পারে।

দুই মাস সময়েই ঘাস কাটিবার উপযোগী হয় কিন্তু ঘাসে ফুল আসিবার আগে খাওয়ানো উচিত নয়। কারণ ইহাতে প্রুসিক এ্যাসিড জাতীয় বিষক্রিয়ার ভয় তখনও থাকে। বছরে ৪ বার কাটিং লওয়া যায় এবং বিঘা প্রতি ফলন দাঁড়াইবে প্রায় ১০০ কুইন্টাল বা তারও বেশী। যে সকল অঞ্চলে মাঝারি বৃষ্টিপাত হয় সেখানে সুদান ঘাস, বরবটি এবং গুয়ারা ইত্যাদির সঙ্গে মিশাইয়া বুনা চলে।

গিনিঘাস

এই ঘাস উষ্ণ আদ্র-আবহাওয়ায় ভাল জন্মায়, খরায় গাছ বাড়নহীন হইয়া হইয়া পড়ে। সেচ দিয়া রাখিলে সারা বছরই গাছ সতেজ থাকে এবং বার বার ঘাস কাটিয়া লওয়া সম্ভব। বর্ষার সময় ইহার ফলন খুবই বাড়ে। এই ঘাসের আবাদ প্রণালী নেপিয়ার ঘাসের মতন। প্রায় সব মাটিতেই জন্মায় কেবলমাত্র যে সব জমিতে জল দাঁড়ায় অথবা জলা জমিতে এই ঘাস দাঁড়াইতে পারেনা। দোঁয়াস মাটিতে ভাল জন্মায় কিন্তু বেলে মাটিতে তেমন ভাল জন্মায় না। তবে খুব বেশী জৈব সার প্রয়োগ করিয়া বেলে মাটিতেও এই ঘাসের চাষ করা সম্ভব। নালার পাশে অথবা গোয়াল ঘরের পাশে ভিজা স্যাঁত স্যাঁতে মাটিতেও এই ঘাস জন্মায়। এই ঘাস ছায়া জায়গায় জন্মানো যায়

সুতরাং ফলের বাগান বা অনুরূপ ছায়া জায়গায়ও এই ঘাসের চাষ হইতে পারে। এই ঘাসের বীজ সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া পড়ে ঐজন্য সম্পূর্ণ গাছের গোড়া মাটি সহ তুলিয়া নিয়া ছোট ছোট ভাগে ভাগ করিয়া দুই হাত অন্তর বসাইতে হয়। লাইনে লাইনেও দুই হাত ব্যবধান থাকে। বর্ষার প্রারম্ভে এই ঘাস বসানো ভাল। অন্য সময় বসাইলে বসাইবার পর সেচ দিয়া জমি ভিজাইয়া দেওয়া উচিত।

গাছ একবার বসিয়া গেলে আর তেমন পরিচর্য্যার দরকার হয়না তবে লাইনের মধ্যকার আগছা নীড়াইয়া রাখা উচিত। গাছ বসাইবার আগে জমি তৈরী করিবার সময় উপযুক্ত পরিমাণে জৈব সার, বিঘা প্রতি ২০—২৫ কুইন্টাল গোবর সার ব্যবহার করিলে এবং প্ররবর্তীকালে টপ ড্রেসিং হিসাবে বিঘা প্রতি ১০—১২ কিলো অ্যামোনিয়াম সালফেট ছিটাইয়া দিলে অধিক ফলন পাওয়া যায়।

দেড় হইতে দুই মাসের মধ্যেই প্রথমবার ঘাস কাটিয়া নেওয়া যায়। বছরে ৫—৬ বার কাটিংস নেওয়া সম্ভব যদি সেচ ও সার ঠিক মতো প্রয়োগ করা হয়। সারা বছরে বিঘা প্রতি ঘাসের ফলন দাঁড়ায় ৭০—৭৫ কুইন্টাল।

বছরে অন্তত দুইবার পরিচর্য্যা করিলে গিনিঘাস একাদিক্রমে ৪—৫ বছর চলে। গাছের বয়স বৃদ্ধির সংগে সংগে ফলন কমিয়া আসে। সুতরাং তিন চার বছর পরে পুরোন গাছ তুলিয়া দিয়া নূতনভাবে চারা বসাইয়া দিতে হয় এবং চারা লাগিয়া গেলে পুরানো গাছ তুলিয়া ফেলিতে হয় ফলে সময় এবং উৎপাদান কোনটাই ব্যহত হয় না। গাছ যখন দেড় হইতে দুই হাতের মত উঁচু হয় তখনই কাটিয়া খাওয়াইলে অধিক পুষ্টিমূল্য পাওয়া যায় কিন্তু সাংবাৎসরিক ফলন অনেক কম হয়। গিনি ঘাস নোপয়ার ঘাসের মত যদিও শক্ত আঁশযুক্ত নহে তথাপি ফুল আসিবার আগেই কাটিয়া খাওয়ানো উচিত।

দুর্ব্বা ঘাস—

দুর্ব্বা ঘাস প্রায় সব রকম আবহাওয়ার জন্মায় এবং প্রতিকূল অবস্থা সহ্য করিতে পারে। গাঁট হইতে শিকড় বাহির করিয়া মাটি বাহিয়া চলে এবং উপরিস্থ মাটিতে চাপ ধরিয়া রাখে। চারণ ভূমির জন্য এই ঘাস সর্বোৎকৃষ্ট। এই ঘাস একবার জানাইলে মাটির ক্ষয় রক্ষা পায়। এঁটেল মাটি কিংবা পলিমাটিতে ইহা ভাল জন্মায় কিন্তু স্যাঁতস্যাতে অববা জল জমা জমিতে ইহা দাঁড়াইতে

পারেনা। দূর্ব্বা ঘাস খরা সহ্য করতে পারে, নোনা জমিতেও জন্মায় এবং ক্ষারযুক্ত জমিতেও জন্মায়।

সাধারণত গাঁট হইতে শিকড় বাহির করা অংশ রাখিয়া কাটিংস করিয়া ইহা বসাইতে হয়। ১০"—১২" লাইনের ব্যবধানে শিকড় শুদ্ধ কাটিংস মাটিতে বসাইয়া দিতে হয়। বসাবার সময় মাটিতে যথেষ্ট রস থাকা চাই। মাটির জোঁ কম থাকিলে কাটিংস বসাইবার পর একটি হালকা সেচ দিয়া দেওয়া উচিত। কাটিং বসানোর সময় একটু হালকা চাপ দিয়া মাটি শক্ত করিয়া দিতে হয়। সাধারণত মার্চ মাসের প্রথম বৃষ্টির পর থেকেই এই ঘাস বসানো চলে।

গাছ বসাইবার পরবর্তী পরিচর্য্যা হিসাবে কোনও আগাছা জমাইতে না দেওয়া এবং কয়েকবার টপ ড্রেসিং হিসাবে বিঘা প্রতি ১৫ কে. জি অ্যামোনিয়াম সালফেট ছিটাইয়া দেওয়া উঠিত।

সাধারণত ঘাস বুনিবার ৩—৪ মাস পরে প্রথম কাটিংস নেবার উপযোগী হয়। তারপরে দুই মাস পর পর কাটিংস নেওয়া যাইতে পারে এবং বছরে ৪—৫ বার কাটিংস নেওয়া যায়। বিঘা প্রতি ঘাস জন্মায় ৫—৬ কুইন্টাল। সেচ ও সারের ভাল প্রয়োগ থাকিলে আরও বেশী ফলন হয়।

দূর্ব্বা ঘাস জমিতে একবার জন্মাইলে উহাকে নির্মূল করা খুবই কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে এবং ভিন্ন কোন ফসল ফলানো সম্ভব হয়না। সেই কারণে আবাদযোগ্য জমিতে কেহ দূর্ব্বা ঘাস জন্মায় না তবে পুকুর পাড় বা অন্যান্য পতিত জমি ও চারণভূমির জন্য এই ঘাসের চাষ হইতে পারে। দূর্ব্বা ঘাসে সুপাচ্য আমিষ উপাদান বেশী এবং আঁশ খুবই কম এবং সব রকম গবাদিপশু ইত্যাদির সুখাদ্য ও পুষ্টিকর খাদ্য।



দূর্বা ঘাস

গবাদি পশুখাদ্যে শিকড় জাতীয় ফসল

গবাদি পশুখাদ্যে শিকড় জাতীয় ফসল বীট, গাজর, সালগম, মিষ্টি আলু ইত্যাদির ব্যবহার হয় কিন্তু মানুষের খাদ্য হিসাবে ইহা আমাদের দেশে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এই সমস্ত সব্জীর বাজারমূল্য অত্যধিক হওয়ায় পশুখাদ্য হিসাবে আমাদের দেশে ব্যবহার হয় না, তবে মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনা না দেখা দিলে এমন অবস্থায় গবাদি পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এমনকি বাঁধাকপি ও ফুলকপির পাতা ও অন্যান্ন সব্জী ফসল আমাদের দেশে গবাদি পশুকে খাওয়ানো হয়। এমন অবস্থায় উৎপাদিত সব্জীর যথাযথ ব্যবহারে আংশিক বাজারমূল্য পাওয়া যায়। শিকড় জাতীয় ফসলের মৃত্তিকা উপরিস্থ গাছ ও পশুখাদ্যে ব্যাপক ব্যবহার আছে। মিষ্টি আলুর লতা গাছ, গবাদি পশুর উপাদেয় খাদ্য। আমাদের দেশে বাধাকপি ও ফুলকপির পাতা গবাদি পশুখাদ্যে ব্যবহার ব্যাপক ভাবে হয়।

মিষ্টি আলু—

মিষ্টি আলুর চাষ যে কোনও জোয়ার ভুট্টা ইত্যাদি ঘাসের চাষ হইতে বেশী শ্রম ও ব্যয়সাপেক্ষ। বিঘা প্রতি ফলন হয় প্রায় ৮-১০ কুইন্টাল। শুষ্ক পদার্থ শতকরা ৩১·৮ ভাগ এবং কার্বোহাইড্রেট বেশী আছে বটে কিন্তু প্রোটিন খুবই কম এবং ক্যালসিয়াম, ও ফসফরাসও খুবই কম আছে। মিস্টি আলুতে ক্যারোটিনের ভাগ বেশী থাকে। গবাদি পশুদিগকে ভুট্টা বা জোয়ার ঘাসের সাইলেজের পরিবর্তে ইহা খাওয়ানো চলে। পুষ্টিমূল্যের তুলনাতে ১ কিলো মিষ্টি আলু ২½ কিলো ভুট্টা বা জোয়ারের সাইলেজের সমান হয়। মাংসের জন্য ভেড়া প্রতিপালনে ৩ কিলো মিষ্টি আলু ১ কিলো ভুট্টা শষ্যদানার কাজ করে। মোটামুটিভাবে গবাদি পশুখাদ্যে ৩ কিলো মিষ্টি আলু ১ কিলো শষ্যদানার সমান পুষ্টিমূল্য।

লাল দোঁয়াশ মাটি মিষ্ট আলু ভাল জম্মায়। লাইনে বুনিতে হয়। লাইনে লাইনে ব্যবধান দেড় হাত। মিষ্ট আলুগাছের লতা ১ হাত পরিমাণে কাটিয়া লাইনে বসাইতে হয়। বৈশাখ জৈষ্ঠ মাসে চাষ হয়। কাটিংস বসানোর পরে ১ সপ্তাহের মধ্যে যদি বৃষ্টি না হয় তবে একবার সেচ দিয়া দিন। চার মাস সময়ে ফলন নেওয়া যায়। বিঘা প্রতি মিষ্ট আলুর ফলন পাবেন প্রায় ১০—১২ কুইন্টাল। মিষ্ট আলুর ফলন ছাড়াও বিঘা প্রতি মিষ্ট আলুর লতা হয় প্রায় ৫ কুইন্টাল। আলুর ফলন না নিয়ে যদি শুধু ঘাসের জন্যই চাষ করা হয় তবে বিশেষ ভ্যারাইটি পশ্চিমবঙ্গের রেঙ্গার ও পুশা সফেদ। মিষ্ট আলু চাষ করিলে ৩-৪ কাটিংসে বিঘা প্রতি ঘাসের (লতার) ফলন দাঁড়ায় প্রায় ৭০ কুইন্টাল বা তারও বেশী। মিষ্ট আলুর লতা গবাদি পশুর উপাদেয় ও পুষ্টিকর খাদ্য এবং গোপালকদের ধারণা মিষ্ট আলুর লতা খাওয়াইলে দুধ বেশী হয়। মিষ্ট আলুর লতায় সাইলেজ তৈরী হয় এবং উহা ভুট্টা সাইলেজের মতোই পুষ্টিকর।

বীট—

পশুখাদ্যে বীটের চাষ বিরল। উত্তর ভারতের কোনও কোনও অংশে বীটের চাষ হয় বটে কিন্তু বাংলায় সাধারণতঃ সব্জীর জন্যই ইহার অল্প বিস্তর চাষ হইয়া থাকে। বীটের পাতা গরু বাছুরকে খাওয়ানো যায়, কিন্তু আংশিক দেওয়া চলিতে পারে কারণ পাতায় অক্সালিক এ্যাসিড রহিয়াছে। একটি গাভীকে একদিনে ৮-১০ কিলোর বেশী বীটের পাতা দেওয়া উচিত নহে, একটি ভেড়াকে ১ কিলোর বেশী দেওয়া উচিত নহে। বীট গবাদি পশুর উপাদেয় খাদ্য। ইহার পাতায় সাইলেজ তৈরী হয়। বীটের পাতা এককভাবে না খাওয়াইয়া শুকনো ঘাসের সহিত খাওয়াইলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এছাড়া শষ্য দানা অথবা চুনিভুষি ইত্যাদির সহিত খাওয়ানো চলিতে পারে। বীটের পাতা খাওয়ানোর সময় প্রতি ১০০ কিলো পাতার সহিত ১৫০ গ্রাম চখ খড়ি মিশাইয়া দিলে অক্সালিক এ্যাসিডের পরিমাণ কমিয়া যায়। বিনা খরচে বীটের পাতা গবাদি পশুকে চরিয়া খাইতে দেওয়াই ভাল কিন্তু নজর রাখিতে হইবে যেন ইহা ইচ্ছামত না খাইতে পারে এবং

পরিমিত ভাবে খাওয়াইবার পর চরানো বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। বীট পাতার সাইলেজ পুষ্টিমূল্যের দিক হইতে ভুট্টা সাইলেজের অর্দ্ধেক।

চাষ সাধারণত আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে হয়। দোঁয়াশ মাটিতে ভাল জন্মায়। গোবর সার দিয়ে উত্তমরূপে জমি তৈরী করে নিন, জমি তৈরীর সময় বিঘা প্রতি ১২—১৫ কে.জি এ্যাঃ সালক, ৬—৭ কে.জি সুঃফসফেট ও ৪—৫ কে.জি পটাশ সার দিয়ে জমি তৈরী করে নিন এবং বিঘা প্রতি ৮০০ গ্রাম—১ কেজি বীজ ছিটাইয়া বুনুন। মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণে জো থাকিলে ১ সপ্তাহের মধ্যেই চারা বাহির হইয়া আসিবে এবং খুব ঘনভাবে চারা বাহির হইবে কারণ আমরা বীটের বীজ হিসাবে যাহা বপন করিব উহা প্রকৃতপক্ষে বীটের ফল এবং এক একটি ফলে ৩।৪টি করিয়া বীজ থাকে। ১৫—২০ দিন পরে ৬—৮ ইঞ্চি অন্তর সবল চারা রাখিয়া বাকী চারা তুলে ফেলে দিতে হয় এবং মাটি হাল্কা করে দিতে হয়, লক্ষ্য রাখিতে হয় শিকড় মাটির উপর চলিয়া আসিলে উহা মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয় এবং পাতা বেশী হইয়া গেলে উহা ভাঙ্গিয়া দিন কারণ বেশী পাতা থাকিলে বীট বাড়িতে পারে না। মাটিতে যেন সব সময় ভাল জোঁ থাকে। ৮০—৯০ দিনের মধ্যেই ফলন লইতে পারিবেন। বিঘা প্রতি ফলন পাওয়া যায় প্রায় ২৫—৩০ কুইন্টাল।

গাজর—

আমাদের দেশে মানুষের খাদ্যের জন্যই গাজরের চাষ হয় কিন্তু খুবই অল্প জমিতে ইহার চাষ হয়। গাজরের চাষে শিকড় জাতীয় যে কোনও ফসলের চাইতে খরচ বেশী এবং ফলন তুলনামূলক অনেক কম হয়। এই সমস্ত কারণে আমাদের দেশে গবাদি পশুখাদ্যের জন্য গাজরের চাষ হয়না বলিলেই চলে। কিন্তু মুরগী প্রতিপালনে সমস্ত শিকড় জাতীয় ফসল খুবই ব্যয় সাশ্রয়কারী উপাদেয় খাদ্য। তার মধ্যে গাজর সব চাইতে বেশী উপকারী কারণ গাজরে প্রচুর পরিমাণে ক্যারোটিন ও ভিটামিন 'এ' আছে। শতকরা ১২ ভাগ শুষ্ক পদার্থ, ১ ভাগ প্রোটিন, ১ ভাগ আঁশ ও ৯ ভাগ শর্করা জাতীয় খাদ্য পুষ্টি বর্তমান আছে। স্নেহ জাতীয় পদার্থ নাই বলিলেই চলে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও বিভিন্ন লবণ জাতীয় উপাদান রহিয়াছে।

৩ কিলো গাজরের পুষ্টিমূল্য, মুরগীর খাবারে আধ কিলো ওটস্-এর পুষ্টিমূল্যের সমান। প্রায় সমস্ত রকম পশু ও পাখী গাজর খুবই পছন্দ করে। রুগ্ন গবাদি পশুর জন্য ইহা খুবই প্রয়োজনীয় কারণ যখন রুগ্ন অবস্থায় গবাদি পশু কোন খাবারই খাইতে চাহে না, তেমন অবস্থায়ও গাজর খাইতে অনিচ্ছা করে না। গাজর এবং গাজরের মাটির উপরের গাছও পশুখাদ্যে ব্যবহৃত হইতে পারে।

সাধারণত আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে বোনা হয়। বীজ লাগে বিঘা প্রতি ৭০০—৮০০ গ্রাম। ছিটিয়ে বোনা হয় আবার লাইনেও বোনা চলে। ঘন চারা বাহির হইলে ৩।৪ ইঞ্চি অন্তর-সবল চারা রাখিয়া বাকী চারা তুলে দিন এবং মাটি হালকা করে দিন, ফলন নেবেন ২ মাস পর থেকেই। বিঘা প্রতি ফলন পাবেন ৬—৮ কুইন্টাল।

সালগম—

আমাদের দেশে পশুখাদ্যের জন্য সালগমের চাষ হয়। সাদা সালগমে জলীয় অংশ হলুদ সালগমের জলীয় অংশের চাইতে বেশী। সাদা সালগমে শুষ্ক পদার্থ আছে ৭-৮ ভাগ কিন্তু হলদে সালগমে আছে ৮-৯ ভাগ শুষ্ক পদার্থ। সুপাচ্য আমীষ উপাদান নাই বলিলেই চলে মাত্র শতকরা ১ ভাগ।

সাধারণত আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে বোনা হয়। বীজ লাগে বিঘা প্রতি ৫০০ গ্রাম। ছিটিয়ে বোনা চলে আবার লাইনে বোনাও চলে। চারা ৪।৫ ইঞ্চি বড় হইলে ৫ ইঞ্চি অন্তর অন্তর সবল চারা রাখিয়া বাকী চারা তুলিয়া ফেলে দিন এবং মাটি বালকা কাটিয়া দিন। ৬০—৭০ দিনেয় মধ্যেই ফলন নিতে পারবেন। বিঘা প্রতি ফলন পাবেন ২০—২২ কুইন্টাল।

এক নজরে কোন ঘাস কখন বোনে, কখন কাটে এবং কত ফলন হয়।

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	বোটানিক্যাল নাম	বোনার সময়	কাটার সময়	ফলন বিঘা প্রতি
১	২	৩	৪	৫	৬
	সয়াবীন	গ্লাইসিন ম্যাক্স	অগাষ্ট	অক্টোবর	৭০-৮০ কে.জি. বীজ ১-১½ কুইন্টাল ভুষা অথবা ১০-১২ কুইন্টাল কাচা ঘাস পাওয়া যায়
	ক্লাস্টারবীন (গুয়ারা)	সিয়ামোপসিস্ টেট্রাগোনালোবা	জুন-জুলাই সেপ্টেম্বর	সেপ্টেম্বর-ডিসে-জানুয়ারী	১০-১২ কুইন্টাল কাচা ঘাস পাবেন। ৭০-৮০ কে.জি. বীজ ফলন্ত গাছ ঘাস। হিসাবে ফলন নিলে ফলন দাঁড়াইবে ২০-২৫ কুইন্টাল।
	মেথী	ট্রিগোনেলা ফোয়ে-নামগ্রেকাম	অক্টোবর	ডিসেম্বর মাসের জন্য	৮-১০ কুইন্টাল ঘাস পাওয়া যায়
	মুগ	ফ্যাসুলাস অরিয়াস	অক্টোবর	ডিসেম্বর	৩৫-৪০ কে.জি. বীজ ৭০-৭৫ ভুষা

খেসারী	ল্যাথিরাস স্যাটিভাস	অক্টোবর	ডিসেম্বর	১০-১২ কুইন্টাল ঘাস পাওয়া যায়
শন (ধইঞ্চা)	ক্রোটালারিয়া জোনসি	অক্টোবর	ফেব্রুয়ারী	৩০-৩২ কুইন্টাল ঘাস পাওয়া যায়
বাজরা	পেনিসেটাম টাইফয়েডস	মার্চ-এপ্রিল	জুন-জুলাই	৮-১০ কুইন্টাল
সুদান ঘাস	সরগম ভালগারি (সুদানীমুসি)	মার্চ-এপ্রিল	অগাষ্ট থেকে আরম্ভ করে ৩/৪ কাটিংস নেওয়া যায়	১৮-২০ কুইন্টাল প্রতি কাটিংসে পাওয়া যায়
গিনিঘাস	প্যানিকাম-ম্যাক্সিমাম	মার্চ-এপ্রিল	জুন থেকে কাটিংস নেওয়া যায় বছরে ৫-৬ কাটিংস	প্রতি কাটিংসে ১২-১৫ কুইন্টাল
দুর্ব্বা ঘাস	সিনাডন ড্যাকটিলন	মার্চ-এপ্রিল	অগাষ্টের পর থেকে কাটিংস নেওয়া যায় ২½-৩ মাস পরে পরে বছরে ৪-৫ কাটিংস নেওয়া যায়	প্রতি কাটিংসে পাবেন ৫-৬ কুইন্টাল

ঘাসের মিশ্র চাষ

ঘাসের মিশ্র চাষের প্রচেষ্টা ও প্রচলন প্রযুক্তিবিদদের এক সার্থক রূপায়ন। পশ্চিম বাংলার আবহাওয়া, ঋতু ও প্রকৃতিগত কারণ ও মাটির নমনীয়তা এই মিশ্র চাষের সহায়ক। কেননা ঋতুগতভাবে সারা বছরে যেমন ছয় ঋতুর আবর্ত্ত লক্ষনীয় তেমন প্রত্যেক ঋতুই একে অন্যের সহমশীল প্রতিশ্রুতি, কেউ অপরের সহিত চরম ভাবাপন্ন নয়। ফলস্বরূপ রৌদ্রের প্রখরতা, বায়ুর আদ্রতা পরস্পর প্রতিশ্রুত, সহনশীল ও সম ভাবাপন্ন। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার উপযোগী ঘাস এমন অনুকূল আবহাওয়ার সহিত মাটির নমনীয়তর ফলে, রস ও খাদ্য সংগ্রহের সহজ ও অনুকুল অবস্থায় থাকায় প্রায় সব ঘাসই সহজে নিশ্চিন্ত ভাবে জন্মানো যায়। সারা বছর ধরিয়া কাঁচা ঘাসের যোগান বজায় রাখিতে ঘাসের এই মিশ্র চাষ পদ্ধতি এক অপরিহার্য্য প্রযুক্তি। ঘাসের মিশ্র চাষে দেখা গিয়াছে উৎপাদিত ঘাসের খাদ্যমূল্য-মানের পর্য্যায় বজায় রাখা সম্ভব এবং উৎপাদিত মিশ্র ঘাস গবাদিপশুর খাদ্য হিসাবে উপাদেয়ও বটে। এজন্য ঘাসের মিশ্র চাষ ক্রমান্বয়ে গোপালকদের নিকট প্রিয় ও পরিচিতি লাভ করিতেছে। দুই বা ততোধিক ফসল জন্মাইবার চরিত্র, মাটি, সেচ, সার, আবহাওয়ার শুষ্কতা, আদ্রতা, খরা, বৃষ্টিপাত ইত্যাদির সমন্বয় করিয়া নির্ধারণ করিতে হইবে। এই মিশ্র ঘাসের চাষ পদ্ধতিতে দুই ফসল বুনিবার ব্যবধান এক হইতে দুই সপ্তাহ হইতে পারে। আবার ইহার কোন এক ফসল বুনিবার সময় সেচ দিয়া জল দাঁড় করাইয়া নিতে হয় কিন্তু অপরটিতে নহে। আবার দুই ফসলের মিশ্রণের জন্য একটির সঠিক অথবা অগ্রিম বুনিবার সময়কে পিছাইয়া আনিয়া, দ্বিতীয় ফসলের সঠিক বুনিবার সময়কে আগাইয়া বুনিবার সময়টিকে সমন্বয় করিয়া নিতে হয়। দুই ফসলের বীজ মিশাইয়া নিয়া একবারেই ছিটাইয়া বোনা চলে। আবার দুই ফসলের বীজ একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ছিটাইয়া বুনিতে হয় এবং ইহা নির্ভর করিবে দুই বীজ এর আকার ও আয়তন এর উপর। আবহাওয়া অনুযায়ী সারা বছরে ঘাসের চাষের পদ্ধতিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

গ্রীষ্ম ও বর্ষায় অর্থাৎ বৈশাখ হইতে শ্রাবণ পর্য্যন্ত প্রথম ভাগ—এই সময়ে নেপিয়ার ঘাস, প্যারা ঘাস, জোয়ার, ভুট্টা ও টিওসিনটি ঘাস জন্মানো চলে। শরৎ ও হেমন্ত অর্থাৎ ভাদ্র হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ভাগ—এই সময়ে গাইমুগ, বিশালমুগ, বরবটি, মটরশুটি ইত্যাদি জন্মানো চলে। শীত ও বসন্ত অর্থাৎ পৌষ হইতে চৈত্র পর্যন্ত তৃতীয় ভাগ—এই সময়ে বারসীম, লুসার্ন, ওটস্ ইত্যাদি ঘাসের চাষ হয়। যে ফসলগুলির আবাদ প্রণালী ও চাষ পদ্ধতি আগে দেওয়া হইয়াছে সেইসব ফসলেরই মিশ্র চাষ কেমন ভাবে হইভে তাহা নিচে বলা হইল।

কোন ফসলের সহিত কোন ফসল মিশাইয়া বুনা চলে

যদি ভুট্টা মরশুমের প্রথম দিকে বুনিতে চান তবে ভুট্টার সহিত বরবটি মিশাইয়া বুনিতে পারেন। বীজের পরিমাণ অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক দিবেন। ভুট্টার সহিত জোয়ার মিশাইয়া বুনিতে পারেন। ভুট্টার সহিত জোয়ার ও বরবটি একত্র করিয়াও বুনিতে পারেন। ভুট্টার সহিত সয়াবীন বুনা যায়। জোয়ারের সহিত ফ্যাসুলাস ক্যালকারেটাস (গাইমুগ) ও ফ্যাসুলাস অরিয়াস (বিশাল মুগ) বুনা যায়। জোয়ারের সহিত সয়াবীনও বুনা চলে। টিওসিনটির সহিত ভুট্টা বুনা যায়। টিওসিনটি, ভুট্টা ও বরবটি একত্রে বুনা যায়। হাইব্রীড নেপিয়ারের সারির মাঝখানে পর্য্যায়ক্রমে (আবহাওয়া অনুযায়ী, বরবটি, ফ্যাসুলাস ক্যালকারেটাস (গাইমুগ) বা অরিয়াস (বিশালমুগ) এবং শীতকালে বারসীমও বুনা চলে। ওটস্ এর সহিত মটর বুনা চলে। ওটস্ এর সহিত বারসীম চাষ করা যায় এবং লুসানের্ণরও চাষ চলে। ওটস্এর সহিত রেপসীডের চাষও চলতে পারে। বারসীমের সহিত রেপসীড (সরষে জাতীয় ঘাস) এর চাষ হয়। ওটস্ এর চাষ তো বারসীমের সঙ্গে চলছেই। তাহলেই দেখা যাইতেছে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালীন ঘাসের সহিত, শরৎ ও হেমন্তকালীন ঘাসকে টানিয়া আনিতেছে, আবার শীতকালীন ফসলের সহিতও শরৎ হেমন্তকালীন ফসলকে ঠেলিয়া দিতেছে, এমন চাষ পদ্ধতিকে রিলেক্রপিং বলা হয়। রিলে ক্রপিংএর বেলায়, নির্দিষ্ট মিশ্রনের ঘাস উৎপাদনের জন্য জমি তৈরী, সার ও সেচের প্রয়োগ, পরবর্তী পরিচর্য্যা, এসমস্ত কিছুরই একক চাষ পদ্ধতি হইতে অল্পবিস্তর হেরফের হইতে পারে। যেমন চরিত্রগতভাবে



নেপিয়ার ঘাসের সারির মধ্যে বারসীম চাষ

একপত্র বীজের সহিত দ্বিপত্র বীজের বেশ কিছু প্রভেদ রহিয়াছে। তেমনভাবে এই সংমিশ্রন ও চাষের বেলায়ও তেমন তেমন নীতি নির্দেশ রহিয়াছে, আর স্বাভাবিকভাবেই তাহা মানিয়া চলিতে হইবে তবেই নিশ্চিত ফসল পাওয়া যাইতে পারে।

আর এক প্রকার মিশ্র ঘাসের চাষ পদ্ধতির নাম দেওয়া হইয়াছে এন্‌সিওরড ক্রপিং মানে নিশ্চিত ফসল। এই পদ্ধতিতে চাষ করিলে ফসল যেমন অতিখরা হইলেও মার খাইবেনা আবার অতিবৃষ্টি হইলেও পুরোপুরি মার খাওয়ার তেমন আশংকা থাকেনা। কেননা কোন কোন বীজ খরাজনিত পীড়া প্রতিরোধ করিতে সক্ষম, আবার কোন কোন বীজ মোটামুটি বৃষ্টি সহ্য করিতে সক্ষম। এবার একটির প্রতিকুল অবস্থায় অপরটি অনুকুল অবস্থায় থাকছে, সুতরাং ফসলের একটি অংশ যে কোন অবস্থার টিকিয়া যাইতেছে, আর যতটাই টিঁকিয়া যাক না কেন তার ফলন হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির গড় ফলন পাওয়া যাইবেই। ইহা সার্ব্বিক সত্য যে, কোন কোন ঘাস সংমিশ্রনে আসিবে, তার জাতি প্রজাতি, চরিত্রগত বৈশিষ্ট সর্ব্বোপরি গড় ফলনশীলতা (পরিমিত জমিতে) ইত্যাদি, সেই সঙ্গে কোন ঘাসের কত কত পরিমাণ বীজ নিয়া এই সংমিশ্রন ঘটাইলে একটির উৎপাদন ব্যর্থতায় অপরটির ফলন হইতে জমির পরিমাণের গড় উৎপাদন পাওয়া সম্ভব হইবে এবং তাহা নিশ্চিতকরণ একটি অবশ্য প্রযুক্তি। যেমন বিঘা প্রতি জোয়ার বীজ ১.৫ কেজি সুদান ঘাস বীজ ১ কেজি বাজরা বীজ ৩০০ গ্রাম, টিউসিন্‌টি ৮০০ গ্রাম, বরবটি ৮০০ গ্রাম, মোট ৪-৪ ½ বা সারে চার কেজি বীজ একত্রে মিশাইয়া বুনিলে অতি খরা বা অতি বৃষ্টিতে ফসল হানির কোন আশংকা দেখা দিবে না। পরন্ত জমির পরিমান অনুযায়ী নিদ্দির্ষ্ট পরিমান ফসল উৎপন্ন হইবেই। পশুখাদ্যে ঘাস চাষের ক্রমান্নতির সঙ্গে সংগে তার বাহুবায়নকে নিশ্চিত করিবার চেষ্টা চালাইয়া যাওয়া হইতেছে।

সাইলেস প্রথায় ঘাস সংরক্ষণ

পশুখাদ্য ঘাস উৎপাদদের ন্যায় ঘাস সংরক্ষণও একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। কারণ আমাদের কৃষি ব্যবস্থায় মধ্যবর্ত্তী বা অন্তবর্তী কালীন মানে দুই অর্থকরী ফসলের মাঝখানের সময়ে ঘাস চাষের জন্য জমিকে ব্যবহার করিয়া নেবার ঝোঁক ও রেওয়াজ হইয়া আসিতেছে। তাই এই মধ্যবর্তীকালীন ঘাস চাষের জন্য গোপালদের প্রচুর আগ্রহ থাকা সত্বেও বেশী জমিতে তারা ঘাস চাষ করেন না। পরবর্তী ফসলের জন্য চাষ করা পর্য্যন্ত তাদের গরু বাছুর যতটা ঘাস খাইবে সেই পরিমানের বেশী চাষ করিতে চাননা। কারণ ঘাস চাষের একটি খরচ আছে, প্রয়োজনের অধিক ফলনকে ঐ অল্প সময়ে তার সীমিত সংখ্যক গবাদি পশুকে খাওয়াইবার পরেও উদবৃত্ত ঘাস। ব্যবহার করিতে না পারিয়া অপচয় হয় বা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করিতে হয়। আজ যে সমস্ত গোপালকরা তাদের গরু বাছুরকে বেশী দিন ধরিয়া ঘাস খাওয়াইতে আগ্রহী এবং বেশী পরিমানে ঘাস উৎপাদনেও সক্ষম তাদের জন্য ঘাস সংরক্ষণ প্রনালী ভালভাবে জানিয়া ও শিখিয়া নেওয়া ঠিক হইবে। সাধারণত গ্রীষ্ম ও বর্ষায়ই আমাদের দেশে অধিক ঘাস উৎপাদন হয়, এবং গ্রীষ্মে যে সমস্ত ঘাস তৈরী হয় তার প্রায় সব ঘাসই সাইলেজ প্রথায় সংরক্ষন করিবার উপযোগী। শীত কালীন ঘাসও সাইলেজ করা যায় কিন্তু তখন তেমন প্রচুর ঘাস পাওয়া কঠিন ও ঘাসের রকম সাইলেজ করিবার খুব উপযোগীও নহে। তাই শীতকালীন ঘাস শুকাইয়া রাখা ভাল। এই শুকাইয়া রাখা ঘাসকে হে বা খড় বলে। সাইলেজ সাধাণত লম্বা পাতা-ওয়ালা ঘাস যেমন, ভুট্টা, জোয়ার, টিউসিনটি, নেপিয়ার ইত্যাদি ঘাস দিয়াই ভাল হয়। শীতকালীন ঘাস ওটসেও ভাল সাইলেজ তৈরী হয়। এককভাবে গ্রীষ্ম ও বর্ষার ঘাস, বরবটি বা ক্যাসুলাম জাতীয় ঘাস দিয়া বা শীতকালীন বারসীম বা লুসার্ণ জাতীয় ঘাস দিয়া সাইলেজ হয় না কারণ এই সব ঘাসে প্রচুর পরিমানে জলীয় পদার্থ রহিয়াছে এবং কার্বোহাইড্রেট কম পরিমানে

রহিয়াছে। এই দুটি ব্যপারই সাইলেজ তৈরী হইবার পরিপন্থী। তবুও বরবটি ঘাসকে ভুট্টা, জোয়ার প্রভৃতি ঘাসের সহিত মিশাইয়া সাইলেজ তৈরী করা যায় আবার বারসীম ঘাসকেও ওট্‌স এর সহিত মিশাইয়া সাইলেজ তৈরী করা সম্ভব হয়। জোয়ার, ভুট্টা, ইত্যাদি ঘাস, বরবটির বেশী জলীয় পদার্থটি টানিয়া নেয় এবং তাদের অধিক কার্বোহাইড্রেটও বরবটিকে দেয়। ওটস্‌ ও বারসীমের বেলাতেও এমনি হয়। শুধু বরবটি বা বারসীম ঘাসে যে সাইলেজ করা যায় না তা নয়, করা যায় বটে কিন্তু ঠিক ঠিক ভাবে সাইলেজ করা একটু ব্যয়সাপেক্ষ হইয়া পড়ে। যেমন ১ঃ৫ অনুপাতে খড় কুঁচাইয়া, খড়ে ঘাস মিশাইয়া নিতে হয়। তাছাড়া ৪০ কিলো চিটে গুড় ১ টন ঘাসে লাগিয়া যাইবে। ভুট্টা সাইলেজ করিবার উপযোগী ঘাস কেননা ইহাতে শর্করার ভাগ বেশী আছে, ইহার ফলে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার কাজ দ্রুত বাড়িয়া যায়। ফলে ল্যাকটিক এ্যাসিডের কাজ বাড়িয়া যায় এবং বিউট্রিক এ্যাসিডের বর্তমান থাকিতে পারে না। ভুট্টা ঘাসের সাইলেজের মান আরো উন্নত করা যায় যদি শিম্বজাতীয় ঘাস, যেমন বরবটি, লুসার্ণ ইত্যাদি ঘাস ইহার সহিত মিশ্রিত করিয়া সাইলেজ করা হয়। সাইলেজ কবিবার জন্য ভুট্টা গাছ সবচাইতে উপযোগী হয় যখন ভুট্টার ফল একটু শক্ত হইতে চলিয়াছে, অন্তত শতকরা ৫০ ভাগ হইয়াছে এবং গাছে শতকরা ৭০-৭৫ ভাগ জলীয় পদার্থ রহিয়াছে। জোয়ার ঘাসের সাইলেজ ভুট্টা ঘাসের সাইলেজের চাইতেও উঁচুমানের হয়। জোঁয়ার, কাঁচা ঘাস হিসাবে খাদ্যমানের চাইতে জোয়ার সাইলেজে খাদ্যমান তেমন কিছু একটা কমে না। খরা জনিত বাড়নহীন তরুণ গাছে যে গ্লুকোসায়ানেড বিশ থাকে উহা সাইলেজ তৈরীতে রাসায়নিক বিক্রীয়ার নষ্ট হইয়া যায় এবং প্রুসিক এ্যাসিড জনিত বিষক্রিয়ার কোনও ভয় থাকে না। তরুণ গাছের চাইতে উপযুক্ত বাড়ন্ত গাছের সাইলেজ আরও ভাল হয় কারণ তরুণ গাছের সাইলেজে এ্যাসিডের ভাগ একটু বেশী হয়, যদিও ভুট্টা বা অন্যান্ন গাছের সাইলেজ প্রস্তুত করিবার সময়ের চাইতেও জোয়ার গাছের সাইলেজ তৈরী করিবার সময় একটু বেশী লাগে কারণ জোয়ার ঘাসে প্রোটিন তুলনামূলকভাবে কম থাকায় সাইলেজ পচনশীলতায় সাহায্যকারী ব্যাকটেরিয়া তেমন দ্রুত কাজ করে না। এইজন্য জোয়ার ঘাসে সাইলেজ তৈরী করিবার সময় অল্প ইউরিয়া ছড়াইয়া দিলে পচণশীলতা দ্রুত আসে, ইহাতে ক্যারোটিন ও অন্যান্ন খাদ্যমান বাড়িয়া যায় ও স্বাদুযুক্ত হয়।

সাইলেজ কি, এবং কেমন করে তৈরী হয়—

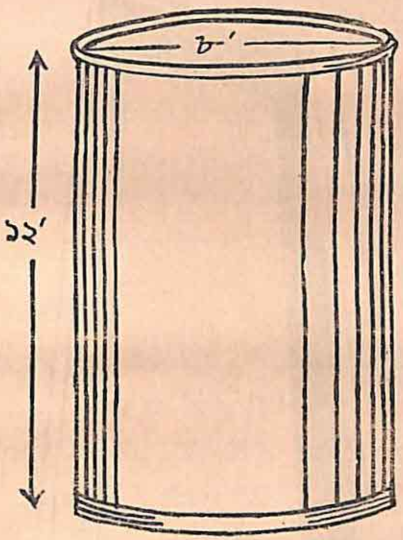
ঘাস কুচিয়ে নিয়ে হাওয়া বাতাস ঢুকিতে পারে না এমন গর্ত্তে বা চৌবাচ্চায় খুব গাদিয়ে পুরিয়া রাখিলে ঘাসের পচনশীলতা আসিয়া যায় ও তখন উহার মধ্যে কয়েক ধরনের এসিড তৈরী হয় যেমন ল্যাকটিক এসিড, এসেটিক এসিড, ও বিউট্রিক এসিড ইত্যাদি। ঐ এসিড-ই ঘাসকে একটা বিশেষ অবস্থায় সংরক্ষণ করিতে সাহায্যে করে। ল্যাকটিক এসিড-এর প্রভাব বেশী হইলে সাইলেজ ভাল হয় কিন্তু বিউট্রিক এ্যাসিড বেশী হইলে সাইলেজ ভাল হয় না, একটা উৎকট গন্ধ হয়। কি কি কারণে ল্যাকটিক এসিড বেশী হইতে পারে, বিউট্রিক এ্যাসিড বেশী হইতে পারে না তারও বিভিন্ন কারণ রয়েছে। কোন কোন ঘাস দিয়া সাইলেজ করিতে হইবে, কোন ঘাস কোন অবস্থায় সাইলেজ করিবার উপযোগী হইবে এবং সাইলেজ করিবার সময় গুড়জল ছিটাইয়া দিতে পারিলে ল্যাকটিক এ্যাসিডের প্রভাব থাকিবে, বিট্রট্রিক এ্যাসিডের প্রভাব থাকিবে না ইত্যাদি। যেমন জোয়ার, ভুট্টা, ওটস্ এইসব ঘাসের যখন ফুল আসিবার সময় হয় বা ফল ধরে এবং ফলে দুধ থাকে তখনই কাটিয়া সাইলেজ করিবার উপযুক্ত সময়।

সাইলেজ তৈরী করিবার জন্য কয়েক রকম ভাবে গর্ত বা চৌবাচ্চা তৈরী করা যায় তবে ট্রেন্স পদ্ধতিতে ঘাস সংরক্ষণ করাই সুবিধা। কোথায় এই গর্ত্ত বা ট্রেন্স খোড়া যাইতে পারে তার উপযুক্ত জায়গা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। জায়গা অবশ্যই উঁচু হইতে হইবে, চারপাশে কোথাও বৃষ্টির জল যেন না দাঁড়ায় বা কোন অবস্থায়ই যেন জল গর্ত্তে ঢুকিতে না পারে। এখন জায়গা হওয়া চাই সেখানকার মাটির নিচেকার জলের লেভেল অন্তত চার মিটারেরও নীচে হয়। ট্রেন্স পদ্ধতিতে সাইলেজ করাই ভাল কারণ নীচের দিকে এর গভীরতা খুব একটা দরকার হয় না। এক মিটার বা তার কম হইলেও চলিতে পারে এবং এইজন্য মাটির তলার জলের লেভেল টেন্স পদ্ধতিতে সাইলেজ তৈরীতে কোন বিঘ্ন ঘটাইতে পারে না। ইহা ছাড়াও ট্রেন্স সাইলোর গভীরতা কম থাকায় খাড়া ভাবে কাটিয়া সাইলেজ তোলার খুবই সুবিধা ও ইহাতে অপচয়ও কম ঘটে।

গর্ত করিয়া যদি সাইলেজ তৈরী করিতে হয় তবে ৮ ফিট ডায়মেটার, ও ১২ ফিট

গভীর করিয়া গর্ত খুঁড়িতে হইবে। এমন গর্তে যে পরিমান সাইলেজ তৈরী হইবে তাতে চারটি গরু মাথাপিছু ২০ কে. জি. সাইলেজ ও ৩ মাস ধরিয়া খাইতে পারিবে। এমন গর্ত করিয়া, ভরাট করিতে ঘাস লাগিবে প্রায় দশটন আর এই দশটন ঘাস জন্মাইতে ২½—৩ বিঘা জমিতে ভাল ফলনের জোয়ার অথবা ভুট্টা ঘাসের দরকার হয়।

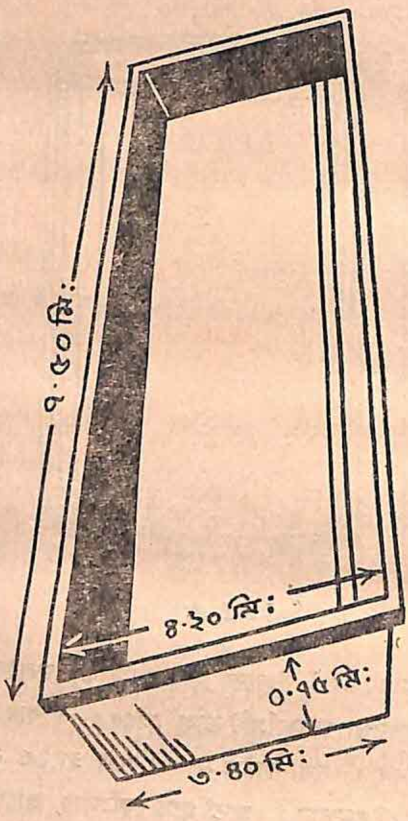
আগেই বলিয়াছি কি কি ঘাসে সাইলেজ হয়, কখন ঘাস কাটিয়া আনিতে হয়। এবার ঘাস কাটিয়া মাঠে একদিন ফেলিয়া রাখুন যেন অন্তত ৪-৫ ঘন্টা



পিট সাইলো

রোদ পায় এবং বাষ্পমোচন ঘটে উহাতে বেশ খানিকটা জলীয় অংশ বাহির হইয়া যাইবে ফলে সাইলেজের কোয়ালিটি ভাল হইবে। এইবার ঘাস পাওয়ার চপ কাটারে কাটিয়া নিন্। চপ কাটার না থাকিলে হাতেও কুঁচাইয়া নিতে পারেন। এইবার গর্তে ফেলুন। গর্তে ঘাস ফেলিবার আগে তলায় কিছু খড় বিছাইয়া নিন। এবং গর্তের দেওয়ালেও খড় ধরাইয়া দিতে থাকিবেন যেমন যেমন গর্ত ভরাট হইতে থাকিবে। ২ ফিট করিয়া ঘাস ভিতরে ছিটাইয়া ফেলিয়া লোক নামাইয়া ভাল করিয়া মাড়াইয়া দিন। এর ওপর খানিকটা গুড় জল ছিটাইয়া দিন। আবার ২ ফিট পরিমান ঘাস দিয়া মাড়াইয়া দিন,

গুড় জল দিয়া আবার ঘাস দিন, এমন করিয়া গর্ত পুরা করুন। মাড়াইয়া দিবার সময় মনে রাখিবেন যেন হওয়া বাতাস কোন প্রকার আর না থাকিয়া যায়। গর্ত যখন পুরা হলো তখন তার উপর আরো কিছু ঘাস চাপাইয়া অন্তত ১ মিটার উঁচু করিয়া দিয়া একটু ঢিপির মত করুণ এবং চাপিয়া তার উপর পলিথিন অথবা প্লাসটিক সিট্ দিয়া ঢাকিয়া দিয়া পরে মাটি চাপা দিন। ভাল করিয়া কাদা মাটি চাপা দিন। ভাল করিয়া কাদা মাটি দিয়া আগাগোড়া পুরু করিয়া লেপিয়া দিন। যেন কোন হাওয়া বা জল, কোন অবস্থায় না ঢুকিতে পারে। কয়েক দিন গেলেই ঘাস বসিতে থাকিবে এবং



ট্রেন্স সাইলো

উপরের লেপা মাটিতে ফাটল ধরিবে। সংগে সংগে আবার মাটি দিয়া ফাটল ফাটল বুজাইয়া দিন। এইভাবে কয়েকবার ফাটল বুজাইতে হইবে। ৮০-৯০ দিনের মধ্যেই সাইলেজ তৈরী হইয়া যাইবে। এইবার গর্তের মুখ খুলিয়া,

উপর হইতে চাপা দেওয়া ঘাস সরাইয়া ফেলুন এবং স্লাইজ কাটিয়া তুলিয়া গরু বাছুরকে খাওয়ান।

ট্রেন্স সাইলো ইঁট সিমেন্ট দিয়া তৈরী করিয়া নিলেই ভালো হয়। ২০ কে. জি. করে মাথা পিছু ৫ টি গরু ১৫০ দিন ধরিয়া খাইতে পারিবে এমন ট্রেঞ্চের মাপ হইবে দৈর্ঘ্য ৭.৫০ মিটার, তলায় চওড়া হইবে ৩.৫০ মিটার, উপর মুখের চওড়া হইবে ৪.২০ মিটার আর গর্ত হইবে ০.৭৫ মিটার। এই সাইজের সাইলো ভর্ত্তি করিতে ঘাস লাগিবে ২২½ টন। ভুট্টা বা জোয়ার ঘাস দিয়া সাইলেজ করিলে ছয় বিঘা জমির (ভাল ফলন) ঘাস দরকার হইবে। ঘাস সংগ্রহ, কুঁচোনো ট্রেন্সে ছিটাইয়া ফেলে মারাইয়া চেপে দেওয়া, গুড় জল দেওয়া, ও ভরাট করিবার পিট সাইলোতেও যেমন, এখানেও তেমন।

সাইলেজ সমস্ত বয়সের গরু বাছুরকেই খাওয়ান যাইতে পারে। যে গরু ঘাস খাইত ৩৫ কে. জি. সে সাইলেজ খাইবে ২৫ কে. জি., যে ঘাস খাইত ২৫-৩০ কে. জি. সে সাইলেজ খাইবে ২০ কে.জি. যে ঘাস খাইত ২০ কে.জি. সে সাইলেজ খাইবে ১৪ কে. জি।

তবে সাইলেজ একক খাওয়াইতে নেই। দুইভাগ সাইলেজ, ১ ভাগ ঘাস ও ১ ভাগ খড় বিচুলি বা ভুষা দিতে হয়। কাজেই যে গরু ঘাস খায় ২০ কে.জি সে পাবে ৭ কে.জি সাইলেজ, ২ কে.জি খড় বা ভুষা ও ৫ কে.জি ঘাস। মনে রাখিবেন দুধের গরুকে দুধ দোহানোর পরে সাইলেজ খাওয়াইতে হয়। দুধ দোহানোর আগে সাইলেজ খাওয়াইবেন না।

উচ্চমানের সাইলেজ প্রস্তুত করিতে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মানিয়া চলা উচিৎ—

যে সব সাইলো কাঁচা অর্থাৎ দেওয়াল পাকা করা হয়নি তাহাতে দেওয়াল ও তলায় ভালভাবে ধান অথবা গমের খড় এমনভাবে ছড়াইয়া দিতে হইবে যেন সবুজ ঘাস মাটির সংস্পর্শে না আসে।

কাটা ফসল মাঠে রাখিয়া একটু শুকাইয়া লইতে হয় যেননা জলীয় অংশ খানিকটা কমিয়া আসে তাহার পর উহা ছোট ছোট করিয়া কুচাইয়া লইতে হইবে, কেননা কুঁচানো ঘাস পরে ভালভাবে চাপিয়া আটসাট করা যায়।

কুঁচানো ঘাস সাইলোতে সমান স্তরে স্তরে ছড়াইতে হয় এবং মাড়াইয়া এমন আটসাট করিতে হয় যেন ভেতরে কোন বাতাস না থাকিয়া যায়। বাতাস থাকিয়া গেলে সাইলেজের মান খারাপ হবে। তাই যত কম সময়ে সম্ভব সাইলো ভর্তি করিয়া ফেলিতে হইবে।

সাইলো এমনভাবে ভর্তি করিতে হইবে যেন উহার উপরিভাগ বসিয়া যাইবার পরও মাটির লেভেলের উপর থাকে। আস্তে আস্তে বসিয়া যাইবে কতোটা, তাহা নির্ভর করে কতোটা বাতাসহীন করিয়া সাইলো বোঝাই করা হইয়াছে, তাহা ছাড়াও ঘাসের রকমের উপর। যেমন শুঁটিজাতীয় ঘাস জোয়ার, ভুট্টা, বাজরার চাইতে একটু বেশী বসিয়া যাইতে চাইবে। তারপর উপরিভাগ পুরু করিয়া মাটির লেপ এমনভাবে দিন যেন কোন অবস্থায়ই ভেতরে বাতাস ঢুকিতে না পারে বা জল চোয়াইতে না পারে।

সাইলেজের মান উৎকৃষ্ট করিবার জন্য কিছু কাটা শস্যদানাও ছড়াইয়া দিতে পারেন। সেই সঙ্গে কিছু খড় ভাল করিয়া কুঁচাইয়া স্তরে স্তরে দিতে পারেন। ভিতরে ঘাস ভালভাবে গাঁজানোর (Fermentation) জন্য স্তরে স্তরে কিছু গুড় জল ছিটাইয়া দিন। পরিমাণে—কুইন্টাল প্রতি ঘাসে প্রায় ১ কিলো গুড় জল।

উপযুক্ত সময়ে ফসল কাটার উপরই নির্ভর করে উচ্চমানের সাইলেজ পাওয়া। ফুল আসা হইতে ফল ধরা পর্যন্ত ফসল কাটিবার উপযুক্ত সময়। এমন সবুজ ঘাসে শতকরা ৮০%—৮৫% ভাগ খাদ্যমূল্য সংরক্ষিত হয়।

সাধারণত ৯০ দিনেই সাইলেজ তৈরী হইয়া যায়। এক সঙ্গে সাইলো না খুলিয়া ভাগে ভাগে অল্প করিয়া তুলুন। যখন যেখান হইতে তুলিবেন একেবারে উপর হইতে নীচ পর্যন্ত তুলিয়া নিন।

মনে রাখিবেন একটি বাড়ন্ত গাভী হইতে দুগ্ধবতী গাভী পর্যন্ত ৬-১০ কিলো পর্যন্ত সাইলেজ খাইবে প্রতিদিন।

ঘাস শুকানো প্রথার সংরক্ষণ

খড় বলিতে আমরা শুকনো ধানের খড়কেই বুঝি। ধান ঝাড়াই মাড়াই করিয়া নিবার পর গাছের যে অংশ (কান্ড ও পাতা) বাকী থাকে উহাই ধানের খড়। বাংলায় শষ্যদানা চাষে ধানই প্রধান ও ব্যাপক। গ্রাম-কেন্দ্রিক পশুপালনে বাঙলা ধানের খড়কে গবাদিপশুর পেট ভরানো খাদ্য হিসাবে চিরাচরিত ব্যবহার করিয়া আসিতেছে কারণ ধানের খড় সহজলভ্য এবং স্বল্প ব্যয়সাপেক্ষ। অবশ্য শষ্য দানা যেমন গম, বার্লি, ওটস্ ইত্যাদি পাকিবার পর ঝাড়াই মড়াই করিয়া লইবার পরে গাছের কান্ড ও পাতাকেও খড় বলা হয়। বিকল্প হিসাবে গ্রাম বাঙলায় পেটভরানোর জন্য গবাদিপশুকে চারণভূমিতে চরিতে দেওয়া হয়। প্রকৃতগত কারণে বর্ষা ও বর্ষার পরে বাংলার মাঠে প্রান্তরে ঘাস তৃণ লতা ইত্যাদি জন্মায়। চরণভূমি হিসাবে পরিকল্পনাধীন ঘাস জন্মানো এবং তাহার পরিচর্য্যা যদিও তেমন সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয়না, তথাপি গ্রাম বাংলায় ধান কাটিয়া নিবার পর পরেই জমির জোঁ অনুযায়ী কলাই বুনিবার রেওয়াজ আগেও ছিল এবং এখনো আছে। ধানের খড় গবাদি পশুখাদ্য হিসাবে খুবই নিম্নমানের, ইহাতে পুষ্টিমূল্য নাই বলিলেই চলে। ক্রুড প্রোটিনের ভাগ মাত্র ০.৯ ভাগ, ক্যালসিয়ম মাত্র ০.২৭ ভাগ, ফসফরাস মাত্র ০.১৬ ভাগ। ধানের খড়ে শক্ত ছিবড়ার ভাগ খুবই বেশী শতকরা ৩৩.৫ এবং ক্ষার জাতীয় অকসালেটের ভাগ শতকরা ১৪.৫ ভাগ থাকায় ধানের খড় গবাদি পশুখাদ্যে খুবই নিম্নমানের। এই সমস্ত কারণের জন্য ধানের খড় একক হিসাবে না খাওয়ানোই উচিত। যদি ধানের খড়ের সহিত আংশিক সবুজ ঘাস মিশাইয়া খাওয়ানো যায় তাহা হইলে খাদ্যমান একটি পর্যায়ভুক্ত হয়। এইজন্য ধানের খড়ের সহিত ভুট্টা ঘাস, জোয়ার ঘাস, ওটস ঘাস ইত্যাদি খাওয়ানো চলে। শিম্বী জাতীয় ঘাস বরবটি, মটর, বারসীম ইত্যাদি ঘাস যদি খড়ের সহিত মিশাইয়া খাওয়ানো যায় তবে খাদ্য মূল্যমান আরো বাড়িয়া যায়। ধানের খড়ের সহিত এই সমস্ত ঘাসকে শুকাইয়া রাখিয়া মিশাইয়া খাইতে দিলেও খাদ্যমূল্যমান অনেকটা বজায়

থাকে। পূর্বভারতের আসামে ধানের ফসল কাটিয়া নিবার পরই জমির জো অনুসারে ধইঞ্চা বুনিয়া দিবার রেওয়াজ আছে। ধান কাটিয়া নিয়া প্রায় দেড় দুইমাস গাদা করিয়া রাখা হয় এবং পরে ঝাড়াই মাড়াই করে। এই দুইমাস সময়ে ধইঞ্চা ঘাস বেশ বড় হইয়া ওঠে। ঐ সময়ে ধইঞ্চা কাটিয়া শুকাইয়া লয় এবং ধানের খড় গাদা দিবার সময়ে স্তরে স্তরে ঐ শুকনো ধইঞ্চা সাজাইয়া রাখা হয়। এই প্রথায় ধানের খড়ের খাদ্যমূল্যমান অনেকটা বাড়াইয়া নেওয়া হয় কেননা ধইঞ্চা শিম্বীজাতীয় ঘাস এবং ইহাতে প্রোটিন ও অন্যান্য খাদ্যমূল্য অধিক আছে। কেবলমাত্র ধইঞ্চা নহে প্রায় সকল প্রকার শষ্য জাতীয় ঘাস যেমন ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, ওটস্ ইত্যাদি ও শিম্বিজাতীয় ঘাস বরবটি, মটর, বারসীম, লুসার্ন ইত্যাদি সকল প্রকার ঘাস শুষ্ক করিয়া রাখা সম্ভব ও ধানের খড়ের সহিত মিশাইয়া গবাদি পশুকে খাওয়াইলে সুফল পাওয়া যায় এবং পেট ভরানোর খাদ্যে পুষ্টিমান বজায় থাকে। একক শুষ্ক ঘাস খাওয়ানো আরও পুষ্টিকর। শষ্য জাতীয় ঘাস শুষ্ক করিয়া রাখিবার জন্য যদি বপন করা হয় তবে ১½—২ গুণ হারে বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয় ফলে খুব ঘন হইয়া চারা বাহির হয়। মাটির খাদ্যাংশ ভাগা-ভাগির ফলে সকল ঘাসই প্রায় সমহারে বাড় নেয় এবং কান্ড সরু হয়। কান্ড আঁশযুক্ত হইবার আগেই ফসল কাটিয়া লইতে হয়। সাধারণতঃ প্রথমবেলায় ফসল কাটিয়া ঐ দিন মাঠে রোদে ফেলিয়া রাখা ভাল। যেমন কাটা হয় তেমন ভাবেই মাঠে রাখিয়া দিতে হয় কিন্তু গাদা করিয়া নহে। ঐ দিনই বিকালে অথবা পরের দিনই শুকাইবার জন্য নির্ধারিত জায়গায় বহন করিয়া আনিয়া ছড়াইয়া শুকাইতে দিন। ঘাস শুকাইয়া রাখা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। রোদে না শুকানোই ভাল কারণ রোদে শুকাইলে অনেকটা খাদ্য-প্রাণ নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং হাওয়াযুক্ত ছায়া জায়গায় যদি বার বার উল্টাইয়া দেওয়া হয় তবে একটু দেরী হইলেও শুকাইয়া রাখা সম্ভব। প্রথম কাটিবার দিন যদি মাঠে ছড়ানো থাকে তাহা হইলে রোদের তাপে খানিকটা পুষ্টিমূল্য (ক্যারোটিন) ঘাটতি হইলেও ঘাসের জলীয় অংশের অনেকটাই শুকাইয়া যাইবে। পরে হাওয়াযুক্ত ছায়া জায়গায় শুকানো উচিত। শিম্ব জাতীয় ঘাস শুষ্ক করা আরো শক্ত কারণ খুব সতর্কতার সহিত না শুকাইতে পারিলে উহার পাতা ঝরিয়া যায় অথচ শিম্ব জাতীয় ঘাসের পাতায় ⅘ অংশ খাদ্যপ্রাণ থাকে। শিম্বজাতীয় কোন ঘাস কখন কাটিলে অধিক খাদ্যপ্রাণ থাকে ইহাও জানা থাকা দরকার যেমন বারসীম ঘাস ফুল হইবার মুখে কিংবা

কেবল ফুল ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে এমন অবস্থায় কাটিয়া শুষ্ক করিলে অধিক খাদ্যমাণ সংরক্ষিত হয়। লুর্মান ঘাসের তৃতীয় কিংবা চতুর্থ কাটিং নিবার সময় কাটিয়া শুষ্ক করিলে খাদ্যমান বেশী বজায় রাখা সম্ভব। বারসীম বা লুসার্ন প্রথম বা দ্বিতীয় কাটিং হইতে শুকাইবার জন্য আনা মোটেই উচিত নহে কারণ ইহাতে জলীয় ভাগ বেশী থাকে এবং শুকাইবার সময় ইহার পাতা অবশ্যই ঝরিয়া যায়। শিম্ব জাতীয় ঘাস শুকাইবার সময় বিশেষ সতর্কতার সহিত উহাদের উল্টাইয়া দিতে হয়। হাওয়াযুক্ত ছায়া জায়গায় শুকাইতে পারিলে সব চাইতে ভাল হয়। আবহাওয়াজনিত কারণে এবং কোন অবস্থায়ই যেন একটুও বৃষ্টির জল না পায় সেসব দিকেও নজর রাখা উচিত। জলীয়াংশ বেশী থাকিলে গাদা দেওয়া অবস্থায় না রাখাই ভাল কারণ উহাতে পচনশীলতা আসিতে পারে। কখনও কখনও পাতা কান্ডের চাইতেও আগে শুকাইয়া যায় এমন অবস্থায় খোলা হাওয়াযুক্ত ছায়া জায়গায় সতর্কতার সহিত ছড়াইয়া রাখিয়া শুকাইয়া লইতে হয়। শষ্য জাতীয় ঘাস ও শিম্বজাতীয় ঘাস যদি একই সঙ্গে শুকাইতে দেওয়া হয় তাহা হইলে ভাল ফল পাওয়া যায় কেননা শষ্য জাতীয় ঘাস, শিম্বজাতীয় ঘাসকে বেশী হাওয়া পাইতে ও শুকাইতে সাহায্য করে এবং পাতা কম ঝরে। খুবই সুষ্ঠভাবে যদি ঘাস শুকানো যায় তবে শষ্য জাতীয় কাঁচা ঘাসের খাদ্যপ্রাণ হইতে মাত্র ১০—১৫ ভাগ ঘাটতি হয় এবং শিম্ব জাতীয় কাঁচা ঘাসের খাদ্যপ্রাণ ঘাটতি হয় প্রায় ২০—৩০ ভাগ। ঘাস শুকাইবার জন্য দিনের তাপমাত্রা, সূর্য্যালোক ও আবহাওয়ার আদ্রতা বিশেষভাবে প্রভাবশীল। বৃষ্টি বা মেঘলা আবহাওয়া ঘাস শুকাইবার জন্য মোটেই উপযোগী নহে। শুকাইবার জন্য সময়কে সংক্ষিপ্ত করিতে পারিলে পুষ্টিমান ও ঘাটতি অনেকাংশে কমানো সম্ভব। ঘাস উপযুক্ত ভাবে শুকাইয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে খড়ের গাদার মতো গাদা করিয়া রাখা ভাল। গাদা করিবার পূর্বে ভালভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে শুকনো ঘাসের কোথাও কোন জলীয় অংশ যেন একটুও বেশী না থাকে। জলীয় অংশ থাকিয়া গেলে গাছের মধ্যে ছত্রাক জন্মাইবে এবং জলীয় অংশ কোথাও একটু বেশী থাকিলে পচনশীলতা পর্য্যন্ত আনিয়া দিতে পারে। সুতরাং গাদায় রাখিবার পূর্বে ভালভাবে দেখিয়া লইবেন। পর পর এবং পর্যায়ক্রমে শুকনো ঘাস একই গাদায় রাখা যায় যদি ঘাসের রকম এক হয়। শিম্বজাতীয় ঘাস শুকাইয়া এককভাবে গাদা করিয়া রাখার অসুবিধা আছে। এইজন্য শিম্বজাতীয় ঘাস শুকাইয়া বান্ডিল করিয়া গাদা

করা উচিত। সাধারণত হাওয়াযুক্ত জায়গায় গাদা দেওয়া ভাল। চালা ঘরে গাদা দেওয়া চলিতে পারে। ঘরে দেওয়াল থাকিলেও প্রচুর পরিমাণে হাওয়া বাতাসযুক্ত ঘর হওয়া চাই। গাদা দেওয়া হইয়া গেলে শুকনো খড় দিয়া ছাউনি দিয়া ঢাকা দেওয়া উচিত। শুকনো ঘাসের মান বিচার করিবার জন্য মনে রাখা উচিত—(ক) ঘাস উপযুক্ত কাঁচা অবস্থার কাটা হইয়াছে, (খ) ঘাস সঠিকভাবে শুকনো হইয়াছে, পাতা ঝরিয়া পড়ে নাই এবং পাতার রং সবুজ রহিয়াছে। (গ) কান্ড নরম আছে এবং কম আঁশযুক্ত। (ঘ) শুকনো ঘাসের কোথাও পচনশীলতা আসে নাই অথবা ছত্রাক জন্মায় নাই। (ঙ) শুকনো ঘাসে কোন আগাছা অথবা খড় কুটা অথবা ধুলা-বালি-মাটি ইত্যাদি নাই। (চ) ভাল শুকনো ঘাসে একটা সোঁদা গন্ধ থাকে কারণ শর্করা ও অন্যান্য খাদ্যপ্রাণ উহাতে বজায় আছে।

শুকনো ঘাসে মান নিম্নগামী হইবার কারণ শুকাইবার সময় (ক) পাতা ঝরিয়া যাওয়া (খ) পচনশীল হওয়া (গ) সূর্য্যের প্রখর রোদে পড়িয়া থাকা (ঘ) বৃষ্টিতে ভেজো, বৃষ্টির জল চোয়ানো ইত্যাদি।

চাড়ন ভূমি

বাংলার মৃত্তিকা, আবহাওয়া ও ঘাসের জাতী প্রজাতী বিবেচনা করিলে, বাংলায় চারণভূমি সৃষ্টি করা ভারতের অণ্যান্ন অঞ্চল হইতে খুবই সহজ। বীরভূম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া ইত্যাদি জেলার মাটি ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের মত নহে আবার জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ইত্যাদি উত্তর বঙ্গের জেলাগুলির আবহাওয়া, মৃত্তিকার প্রকারভেদ দক্ষিণবঙ্গের ২৪ পরগণা জিলার মত নহে। তথাপিও জমির প্রকারভেদে কিছু তারতম্য থাকিলেও এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ একটু বিভিন্ন হইলেও এবং আবহাওয়ার আদ্রতায় খানিকটা তারতম্য থাকিলেও একটি মোটামুটি সমতা রহিয়াছে। চারণভূমির উপযোগী ঘাসের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করিলে কোন ঘাস কোন মাটিতে সহজে জন্মায়, কোন ঘাস জন্মাইতে কত জল বা বৃষ্টিপাতের দরকার, কোন ঘাস কোন আবহাওয়ার (উষ্ণ, আদ্র, শীত ইত্যাদি) ভাল দাঁড়ায়, এবং কতটা কম বা বেশী আবহাওয়াজনিত প্রতিক্রিয়ায় সহনশীল ইত্যাদি বিবেচনা করিলে দেখা যায় পশ্চিমবাংলায় চারণভূমি সৃষ্টি করা ভারতের অন্যান্য অঞ্চল হইতে খুবই সহজ।

চারণভূমি সৃষ্টি করিবার জন্য দীর্ঘ প্রান্তর ব্যক্তিমালিকানায় পাওয়া দুস্কর। পশ্চিমবাংলায় এমন অনেক দীর্ঘ প্রান্তর বা অঞ্চল রহিয়াছে যেখানে অর্থকরী ফসল জন্মানো সম্ভব এখনও হয় নাই বা বছরে একবার অর্থকরী ফসল তুলিয়া নিলে বছরের বাকী দীর্ঘ সময় জমি পতিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে এবং জমি আর কোনও ব্যবহার হয় না। এইসব দীর্ঘ প্রান্তরে বহু মালিকানায় জমি থাকায় দীর্ঘ চারণভূমি সৃষ্টি করার অন্তরায় হইয়া আছে। আবার এই দীর্ঘ প্রান্তরে চারণভূমি তৈরী করিলেও উৎপাদিত ঘাসের সদ্ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত সংখক গবাদি পশু থাকাও প্রয়োজন। এই সব দীর্ঘ প্রান্তরে চাষ আবাদে কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার ব্যয় সংকোচের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। সুতরাং দীর্ঘ প্রান্তরে চারণভূমি তৈরী করার বাধা ও অসুবিধা ব্যক্তি মালিকানায় অতিক্রম করা খুবই অসম্ভব তার চাইতে বড় সমস্যা উৎপাদিত ঘাসের

(চারণভূমিতে) সদ্ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক গবাদি পশু ও অন্যান্য পশুর অভাব। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে চারণভূমির সৃষ্টি ও তাহার সদ্ব্যবহার একমাত্র সরকারী প্রচেষ্টা অথবা সরকার সহযোগী কো-অপারিটিভ ভিত্তিক হইলে হয়তো সম্ভব হইতে পারে। বাংলার যে সমস্ত অঞ্চলে অর্থকরী ফসল খুব একটা লাভ জনক হইয়া উঠে না অথবা যে সমস্ত অঞ্চল আদৌ অর্থকরী ফসলের জন্য ব্যবহার করা সম্ভব হয়না তেমন সমস্ত অঞ্চলে ব্যক্তি মালিকানায় ছোট বা মাঝারি ধরণের চারণভূমি সৃষ্টি ও সংরক্ষণ করা সম্ভব হয় যদি ব্যবস্থাপনা ও প্রযুক্তি নির্ভুল হয়। আবহাওয়া ও মৃত্তিকার রকমভেদ এবং জল ও বৃষ্টিপাত ইত্যাদি বিবেচনায় রাখিয়া ঘাসের বীজ নির্দ্ধারণ করা প্রাথমিক ও মৌলিক কাজ। কোন কোন এলাকার কোন কোন পশু চারণের উপযোগী, এই সবই নির্ভর করে পশুর আকার, ধাতুপ্রকৃতি, আহার্য্য ও দৈনিক আহার্যের পরিমাণ এবং দৈনিক আহার্য্যের পরিমাণের সহিত উৎপাদিত ঘাস ও ঘাসের রকম এবং পরিমাণের সামঞ্জস্য রাখা আর সেই সহিত অন্যান্ন বিবেচনাগুলি সুসংহত থাকা দরকার।

প্রযুক্তি যদি নির্ভুল হয় তবে পশু উৎপাদন ও প্রতিপালনের ব্যয় শত করা ২৭-৫৫ ভাগ কমাইয়া আনা সম্ভব। একটি দুধের গাভীকে যদি ভাল ঘাসের চারণভূমিতে বছরে ২০০ দিন চারণভূমির কাঁচা ঘাসে চড়িতে দেওয়া হয় তাহা হইলে দেখা গিয়াছে গোয়ালে রাখিয়া সারা বছরে খড়, বিচুলি ও সুষমখাদ্যের (চুনি, ভুষি, খইল ইত্যাদি) খরচের মাত্র একতৃতীয়াংশ খরচের দরকার হয়। ভেড়া ও ছাগল যদি শতকরা ৭০-৯০ দিন চড়িয়া খাইতে না পারে তাহা হইলে লাভের অংশ খুব একটা চোখে দেখা যায়না। শূকরের বেলায়ও ঐ একই প্রশ্ন আসে। তাদের তরুণ বয়সে ভাল ঘাসের চারণভূমিতে চড়িতে দিলে যৌবন আসিবে নির্ধারিত, নিশ্চিন্ত সময়ের মধ্যে এবং খরচও অনেক কমিয়া আসিবে তবে চারণভূমির ঘাসের রকম যদি সরষে জাতীয় হয় বারসীম বা লুসার্ন জাতীয় হয়। ইহাতে শরীরের ওজনের প্রতি ১০০ কেজিতে খাওয়া খরচের প্রায় ১০ ভাগ হের ফের ঘটে। মুরগীর বেলাতেও এই একই কথা আসিয়া যায়। মুরগীকে সবুজ ঘাস যেমন বারসীম, লুসার্ন, লন হইতে ছাটা দুর্বা ঘাষ ইত্যাদি ইহা ছাড়াও তরিতরকারীর অংশ বিশেষ যেমন বাধাকপির পাতা বীট গাজরের উপরের পাতা, সরষে জাতীয় গাছের কচিপাতা ইত্যাদি। বাড়ন্ত মুরগী ও ডিম দেওয়া মুরগীর জন্য আবশ্যক না হইলেও ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য। অবশ্য এইপ্রকার খাদ্য মুরগীকে বিকালের দিকে খাওয়ালেই

ভাল ফল পাওয়া যায় এবং প্রতি ১০০ মুরগী দৈনিক খাইবে মাত্র ২-৩ কিলো। আর যদি সারাদিনের খাদ্য হিসাবে এই সমস্ত কাঁচা ঘাস ও তরিতরকারীর অংশ বিশেষ দেওয়া হয় তবে পরিমাণের দরকার মাত্র ১½-২ গুন অর্থাৎ ৫-৬ কে.জি। ভাল কাঁচা ঘাস ও সব্জী খাওয়াইলে মুরগীকে সুষম খাদ্য না দিলেও চলে। ইহাতে মুরগী পুষিবার খরচে একটি বড় রকম তারতম্য ঘটে। সুতরাং ভাল চারণভূমি এবং কাঁচা ঘাস উৎপাদনের খামার থাকিলে গবাদি ও অন্যান্য পশু পাখী প্রতিপালনের খরচ একটি সন্তোষজনক অংকে নামাইয়া আনা সম্ভব এবং ইহার প্রায় সম্পূর্ণটাই লাভের অংকে গণনা করা সম্ভব।

চারণভূমি ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ সম্পর্কে ভাল জ্ঞান না থাকিলে দেখা যাইবে বছরের কোন কোন সময়ে কাঁচা ঘাস থাকছে, কখনও বা বেশ দীর্ঘ সময়ের জন্য কোন কাঁচা ঘাস আদৌ থাকছে না। এই জন্য জানা থাকা দরকার কি ধরণের পশু চারণভূমিতে চড়িবে কত সংখ্যক পশু চড়িবে, কতদিন ধরিয়া চড়িবে, কি ধরনের পশুর জন্য কোন ধরণের ঘাস উপযোগী, মাটি ও আবহাওয়ায় তেমন ধরণের ঘাস উৎপাদন করা সম্ভব কিনা, পরবর্তী কি কি ঘাস বুনা যাইতে পারে। রীলে পদ্ধতিতে ঘাস বুনা সম্ভব কি না, এনসিও ক্লপিংতো রাখিতেই হইবে, বাম্পার ক্লপিং এর জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা, কেননা বড় ধরণের পশু যেমন গবাদি পশুর দৈনন্দিন প্রয়োজন, ছোট ছোট পশু যেমন ভেড়া ছাগল ইত্যাদির চাইতে গুণিতক হিসাবে বেশী। সুতরাং বিভিন্ন জাতী-প্রজাতির ঘাস এবং তাহাদের আবাদ ও উৎপাদন সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত নির্দেশ জানিয়া নেওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয়। কোন ঘাসে কত খাদ্যমান রহিয়াছে, এবং ঘাসের কোন অবস্থায় খাদ্যমাণ কম বা বেশী হয়, যেমন কোন কোন কোন ঘাসের কচি অবস্থায় প্রোটিন ভাগ বেশী থাকে আবার কোন কোন ঘাসে ফুল আসিয়া গেলে, ফল ধরিবার মুখে রাসায়ণিক উপাদান বাড়িয়া যায় ইত্যাদি, এবং তাহার উপযুক্ত ব্যবহার যেমন মাংসের জন্য বাড়ন্ত পশুকে খাওয়ানো অথবা দুধের জন্য দুগ্ধবতী গাভীকে খাওয়ানোর জন্য সুনির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া ইত্যাদি।

চারণভূমির সঠিক ব্যবস্থাপনার একটি বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। আমাদের দেশে বর্ষার বৃষ্টিতে ঘাসের উৎপাদন অবশ্যই বাড়ে কিন্তু খরার মরশুমে সেচ না থাকিলে গাছের বাড় তেমন থাকে না। এলাকা বিশেষ বায়ুর আদ্রতা, তাপাঙ্ক জমির রকমভেদ এই সবকিছুকেই বিবেচনায় রাখিয়া উপযোগী দ্বিপত্রবীজের ঘাস নির্ণয় করিয়া দেওয়া অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। চড়াইবার জন্য সঠিক

পশুখাদ্য ঘাসে রাসায়নিক সংযুক্তি

ঘাসের নাম ও বোটানিক্যাল নাম	ইথর নর্যাস	নাইট্রোজেনযুক্ত নির্য্যাস	অশোধিত আঁশ	অশোধিত প্রোটিন	মোট ভস্ম
নেপিয়ার— পে—পারপিউরিয়া	২,৬৬	৪৭,০৭	২৮,০৭	৬,১৬	১৬.০৪
পে-টাইফয়েডম	১,৪০	৫৩·৩৪	৩৫·১৩	৩·৭৬	৬.৩৭
জোয়ার/সরগম ভালগারি				৬·৭৪	৮.১৫
ভূট্টা/জিয়া মেইজ	২·০৯	৪৭,০৭	৩৫,৯৫		
টিওসিনটি/ইউক্লিনা মেক্সিকানা	১·২০	৫১.৩৩	৩২·২০	৪·৪৭	১০,৮০
বারসীম/ট্রিফলিয়াম আলেকজান্দ্রিয়াম	১.৮৯	৪০·৬৯	২৫·৯১	১৭·৩৫	১৪.১৬
লুসার্ন মেডিকাগো স্যাটিভা	১·৮১	৩৪,৬৮	২৯,১১	১৯,৯০	১৪.১০
ওটস এ্যাভেনা স্যাটিভা	২,৫০	৪-,১০	৩৮,২০	৫,৩০	১০.৯০

গাছের বিভিন্ন বাড়ন্ত অবস্থায় রাসায়নিক সংযুক্তির হেরফের ঘটে

নীতি ও পদ্ধতি মানিয়া চলাও অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে পড়ে কেননা উহাতে চারণভূমিকে আরও অধিক লাভজনক করিয়া তোলা সম্ভব। নজর রাখিতে হয় বোনা ঘাসের বাড় বাড়ন্ত অবস্থা ও অবাঞ্ছিত না বোনা ঘাসকে ঠাই করিতে না দেওয়া। সঠিক ব্যবস্থাপনায় বোনা ঘাসের প্রোটিন, জমিতে সার না দিলেও পাওয়া যাইতে পারে।

যে সকল অঞ্চলে বায়ুর আদ্রতা বেশী সেইসব অঞ্চলে একপত্র বীজের ঘাস অল্প সময়ে বড় হইয়া যায়। নজর রাখা দরকার ঘাসগুলি যেন ফলে না আসে, তাহাতে ঘাসে ছিবড়া হয় তাহাতে ঘাসের ছিবড়া অংশ ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া যাইবে। মিশ্রচাষে, মানে দ্বিপত্রীবীজের সহিত একপত্র বীজ মিশাইয়া যদি বোনা থাকে তবে একপত্রবীজের গাছ তাড়াতাড়ি বড় হইয়া যাইবার ফলে দ্বিপত্রবীজের ঘাসগুলি ছায়াছন্ন হইয়া পড়ে এবং এই সুযোগে না বোনা ঘাস অথবা আগাছা বহাল তবিয়তে দাঁড়াইয়া যাইবে, সুতরাং এমন মিশ্র বোনা চাষের ঘাস উপযুক্ত সময়ে চড়াইয়া খাওয়াইয়া দেওয়াই ভাল। বছরে অন্তত একবার মুড়িয়া খাইবার জন্য চড়িতে দেওয়া উচিত আর এইজন্য ভেড়া ও ছাগলই উপযোগী পশু ; কিন্তু একই জমিতে একই মরশুমে বার বার চড়ানো খুবই অনুচিত কারণ ইহাতে ফলন অত্যন্ত কম পাওয়া যায়, শুধু তাহাই নয় ইহাতে বোনা ফসল দুর্বল হইয়া পড়ে ও মরিয়া যাইতে থাকে কেননা এমন অবস্থায় গাছগুলি শিকড়ের মধ্যেও তাহাদের জীবন লুকাইয়া রাখিতে পারে না। বোনা ঘাস উপযুক্ত বাড় না পাইবার আগেই যদি চড়িয়া খাইতে দেওয়া হয় তাহা হইলে ধকল সামলাইয়া উঠা কঠিন হইয়া পড়ে এবং পরবর্তী বাড়ন নিতে অসুবিধা হয়। ইহার সমস্ত কিছুই সতর্কতার সহিত লক্ষ্য রাখা উচিত। একই মাঠে বার বার না চড়াইয়া রোটেশন পদ্ধতিতে অথবা একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধান রাখিয়া চড়াইলে এই ধরনের ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হয়। আবার কখনও কখনও দেখা যায় সমান ও সঠিকভাবে চড়িয়া না খাইয়া গেলে কোথাও কোথাও ঘাস থাকিয়া যাইতেছে তেমন ঘাসগুলি বড় হইয়া পরে ফল ধরিতে পারে সুতরাং তেমন না চড়িয়া খাওয়া ঘাসগুলি একটি মোটামুটি উচ্চতা হইতে কাটিয়া দেওয়া উচিত। কখনও কখনও দেখা যায় গবাদি পশু চড়িয়া খাইবার পর যেখানে যেখানে গোবর পড়িয়াছে সেইখানকার ঘাস পরবর্তী অবস্থায় খুব ভাল বাড়ন পাইয়া যায় কিন্তু পরবর্তী চাড়নের সময় দেখা যায় গবাদি পশু ক্ষুধার্ত থাকিলেও ঐ ঘাসগুলোতে মুখ দিতে চাহে না। সুতরাং

চড়িবার সময় যে গোবর ত্যাগ করে তাহা কোঁদাল দিয়া মাঠময় সঙ্গে সঙ্গে ছড়াইয়া দেওয়া অথবা তুলিয়া নেওয়া উচিত।

একই চারণভূমিতে ধারাবাহিক বিভিন্ন পশুকে চড়িতে দিলে একটা সমাহারে ঘাসের সঠিক ও সম্পূর্ণ ব্যবহার হওয়া সম্ভব আর রোগ বীজানু সংবহ বা সংক্রমনের সম্ভবনাও কম থাকে। চারণভূমির যথপযোগী ব্যবহারের জন্য ছায়া ও ছায়ার জন্য বড়গাছ অথবা চালাঘর তৈরী করিয়া দেওয়া দরকার। পরিমিত পানীয় জলেরও ব্যবস্থা রাখা দরকার।

রোটেশন পদ্ধতিতে চারণভূমির সদব্যবহার করিতে হইলে দুই বা ততোধিক ভাগে একটি নিদিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ঘাস বুনিয়া দিতে হয় ফলে বিভিন্ন অংশের ফসলের বাড়ন এক একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে হইতে থাকিবে। ইহাতে প্রথম বোনা ফসল যখন ৪-৬ ইঞ্চি হয় তখন হইতেই চড়িয়া খাওয়ানোর উপযোগী হয় এবং এই ঘাস চড়িয়া খাওয়ানোর শেষ হইতে দ্বিতীয় অংশের ঘাস বাড়ন নিয়া থাকে এবং চড়ানোর উপযোগী হয়। এমন করিয়াই তৃতীয় ও চতুর্থ অংশে চড়ানো হইতে পারে। সুতরাং বীজ বুনিবার মুখেই হিসাব করিয়া এক এক অংশ একটি সময়ের ব্যবধানে বুনিতে হয়। বর্ষার সময় ঘাস দ্রুত বাড়ে এই বাড়নের সহিত সাঙ্গতি রাখিয়া চড়াইয়া খাওয়াইবার মত যথেষ্ট সংখ্যক পশু না থাকিলে ঘাস অনেক বাড়তি হইতে পারে, এমনক্ষেত্রে উপযুক্ত ঘাস কাটিয়া শুকাইয়া রাখা সম্ভব অথবা সাইলেজ প্রস্তুত করাও যাইতে পারে। দ্বতীয়বার ঘাস বাড় নেয় তখন চারণভুমিতে চড়াইয়া খাওয়ানো যাইতে পারে। রোটেশন পদ্ধতির জন্য প্লটগুলি আঁইল বাধিয়া আলাদা আলাদা করিয়া দিলে ভাল হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে চারণভুমিকে সুব্যবস্থায় রাখিতে যেমন জল, মাটি, আবহাওয়ার সহিত ফসলের রকমভেদের প্রযুক্তির প্রয়োজন হয় তেমন চড়াইবার পদ্ধতি ও ফসলের সর্বাধিক ব্যবহারও ভালভাবে জানা থাকা দরকার।

স্থায়ী এবং ভাল চারণভূমির জন্য কৃষি বিজ্ঞানের সকল প্রযুক্তি প্রয়োগ করিতে পারিলে সারা বছর বিভিন্ন উন্নতমানের ঘাস পর্যাপ্ত পরিমাণে ফলানো সম্ভব হয়। ইহাতে সেচ ও সারের যেমন যথাযথ প্রয়োগের দরকার হয় তেমন উচ্চ খাদ্যমান উপাদানযুক্ত ঘাসের চাষ সারা বছরেই পর্যাপ্ত পরিমাণে হইতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত ব্যয়সাপেক্ষ উৎপাদিত ঘাসের সঠিক ও যথাযথ ব্যবহার অর্থাৎ বাড়ন্ত পশুর খাদ্য হিসাবে এবং দুগ্ধবতী গাভীর খাদ্য হিসাবে সম্পূর্ণ ব্যবহার না করিতে পারিলে আর্থিক দিকে একটি ফাঁক

দাঁড়াইয়া যাইতে পারে। যাহারা আর্থিক দিকে পূরা তথ্য রাখেন এবং সীমার মধ্যে থাকিয়া অধিক উৎপাদনে বিশ্বাসী তাহারা উন্নত কৃষিখামারে বিজ্ঞানের প্রযুক্তি লাভজনক বলে মনে করেন।

পাহাড়ের ঢালু অঞ্চল অথবা পাথর ও কাকড়যুক্ত শক্ত মাটিতে যেখানে লাঙগল চালানো মোটেই সম্ভব নয় সেইসব অঞ্চলেও চারণভূমি গড়িয়া তোলা সম্ভব। কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার সেখানে অবশ্য প্রয়োজনীয়। মাটির শক্ত আবরণকে ডিস্ক হ্যারো চালাইয়া যতোটা সম্ভব ভাঙিয়া লইয়া, সহজভাবে জন্মাইতে পারে এমন একপত্র ও দ্বিপত্রবীজ বিশিষ্ট ঘাসের বীজ যাহা খরা ও প্রতিকূল অবস্থা সহ্য করিতে পারে এবং সহজে অংকুরোদগম্ হয়, বৃষ্টিপাতের সাথে সাথে এমন বীজ ছড়াইয়া দিলে কিছু ভাগ বীজ গাছে পরিণত হইবে, তাহা যত কমসংখ্যকই হোক না কেন। কোন কোন ঘাসের মূল শক্ত পাথর বা কাকড় মাটির ফাটল দিয়া অভ্যন্তরে চলিয়া যায়। বর্ষব্যপী শক্ত ঘাস যেমন দূর্বাঘাস একবার কিছুমাত্রও দাঁড়াইতে পারিলে সহজে মরে না। লম্বা শিকড়যুক্ত শিম্বজাতীয় ঘাস যদিও না দাঁড়াইতে পারে কিন্তু একপত্রবীজ ঘাসের (ফাইব্রাস রুট) জাল শিকড়যুক্ত ঘাস কিছু কিছু অবশ্যই দাঁড়াইতে পারে। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জৈব সার দিয়া পর পর কয়েক বছর যান্ত্রিক চাষ করিলে ভেড়া ছাগল ইত্যাদি পশুর চারণভূমি তৈরী করা তেমন অঞ্চলেও সম্ভব।

নদীনালার চড়াভূমি যেখানে স্বভাবতই কোন চাষ-আবাদ হয় না এবং উপযোগী নহে, তেমন অঞ্চলের জমির ক্ষয়নিরোধের জন্য স্থায়ী ঘাসের বীজ ছড়াইয়া ব্যবস্থা নেওয়া যায়। আঞ্চলিক আবহাওয়া অনুযায়ী এই সমস্ত ঘাস বীজ নির্ণয় করা হয়। অল্প আয়াসে জন্মাইবার মতো ছোট ছোট ঘাসের বীজ আবহাওয়ার সুযোগ মতো ছড়াইয়া গেলে এবং যে সমস্ত ঘাস সহজে জন্মায় ও বিভিন্ন ধরণের মৃত্তিকায় সহজে দাঁড়াইতে পারে এমন সমস্ত ঘাসের বীজ ছড়াইয়া গেলে যত কম বীজই ঘাসে পরিণত হউক না কেন তাহাই ছোট ছোট পশু যেমন ভেড়া ছাগল ইত্যাদির চড়িয়া খাইবার উপযোগী হয় এবং ঐ অঞ্চল চারণভূমি হিসাবে ব্যবহার করা চলে। যে সমস্ত অঞ্চলে স্থায়ী ঘাস অধিক পরিমাণে জন্মানোর উপযোগী আবহাওয়া ও মৃত্তিকা রহিয়াছে সেইসব অঞ্চলে গবাদি পশুর জন্য চারণভূমি তৈরী করা খুবই সম্ভব।

বাঙলায় খাদ্য ও অর্থকরী ফসলের অন্তবর্ত্তী সময়ে ঘাসের ঘাস

ফসলের নাম	জমির রকম	শেচ	বোনার সময়	কাটার সময়
ভুট্টা	উচু জমি	শেচ আছে	এপ্রিল	জুন
জোয়ার	উচু জমি	শেচ আছে	জুলাই	সেপ্টেম্বর
বারসীম/লুসার্ন/ওটস	উচু জমি	শেচ আছে	নভেম্বর	জানুয়ারী—মার্চ
ভুট্টা/জোয়ার	উচু জমি	শেচ আছে	এপ্রিল	জুলাই
বরবটি/গাইমুগ	উচু জমি	শেচ আছে	অগাষ্ট—সেপ্টেম্বর	অক্টোবর—নভেম্বর
লুসার্ন/বারসীম	উচু জমি	শেচ আছে	নভেম্বর	জানুয়ারী—মার্চ
পাট	উচু জমি	শেচ আছে	মার্চ	জুলাই
আমন ধান	উচু জমি	শেচ আছে	জুলাই	নভেম্বর
বারসীম	উচু জাম	শেচ আছে	নভেম্বর	জানুয়ারী—মার্চ
জোয়ার/বাজরা/ভুট্টা	উচু জমি	শেচ নেই	মে, জুন	অগাষ্ট
গাইমুগ	উচু জমি	শেচ নেই	অগাষ্ট—সেপ্টেম্বর	ডিসেম্বর—জানুয়ারী
আউস ধান/পাট	উচু জমি	শেচ নেই	মে, জুন	অগাষ্ট—সেপ্টেম্বর
গাইমুগ	উচু জমি	শেচ নেই	অগাষ্ট—সেপ্টেম্বর	জানুয়ারী
বরবটি	অল্প উচু জমি	শেচ নেই	এপ্রিল—মে	জুন—জুলাই
আমন ধান	অল্প উচু জমি	শেচ নেই	জুলাই—অগাষ্ট	নভেম্বর—ডিসেম্বর
আমন ধান	নীচু জমি	শেচ নেই	জুলাই—অগাষ্ট	নভেম্বর—ডিসেম্বর
গাইমুগ	নীচু জমি	শেচ নেই	নভেম্বর—ডিসেম্বর	মে—জুন

ঘাস উৎপাদনের খামার

ঘাস উৎপাদনের খামার ব্যাবস্থাপনা কৃষি বিজ্ঞানের এক বিশেষ প্রযুক্তি। সেখানে বিভিন্ন মরশুমে ভিন্ন ভিন্ন উন্নতমানের ঘাসের চাষ রোটেশন পদ্ধতিতে হইয়া থাকে। কোন কোন ঘাসের চাষ হয় কচি অবস্থায় কাটিয়া শুস্ক ঘাসে পরিণত করিয়া সংরক্ষণের জন্য। কোন কোন ঘাসের বীজ নিবার পর ঘাসকে খড়ে পরিণত করিবার জন্য। কোন কোন ঘাস জন্মান হয় কেবলমাত্র কচি ও কাঁচা অবস্থায় পশুদের খাওয়াইবার জন্য আবার সাইলেজ করিয়া ঘাস সংরক্ষণের জন্য উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন ঘাস জন্মানো হয়। ইহা ছাড়াও চড়িয়া খাইবার জন্য বিভিন্ন দ্বিপত্রবীজবিশিষ্ট শিম্বজাতীয় ঘাসের চাষ হইয়া থাকে। গবাদি পশু চড়িবার জন্য একটু উচ্চতা বিশিষ্ট ঘাস যেমন বাঞ্ছনীয়, তেমন ভেড়া, ছাগল, শুকর ইত্যাদি পশুর জন্য অল্প উচ্চতা বিশিষ্ট ঘাসই বাঞ্ছনীয়। শিকড় জাতীয় ফসলও পশুখাদ্যের জন্য চাষ হইয়া থাকে। যেমন বীট, গাজর, সালগম, মিষ্টিআলু ইত্যাদি। পর্য্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা থাকিলে পশুখাদ্যের জন্য বাঁধাকপির চাষও হইয়া থাকে।

পশু উৎপাদনের খামার যদি বিভিন্ন গবাদি পশু, ভেড়া, ছাগল ও শুকর ইত্যাদি সমন্বিত হয় এবং উহাদের সংখ্যা পর্য্যাপ্ত থাকে এবং একর প্রতি উৎপাদিত ঘাস ও তাহার যথাযথ সদ্ব্যবহার হয় তাহা হইলে পশুখামার হইতে প্রায় দ্বিগুণ লাভ আসে কারণ পশু ও পশুজাভ উৎপাদন ব্যয় শতকরা প্রায় ৫৫ ভাগ কম হয়। সুতরাং ঘাস উৎপাদন খামার পশু উৎপাদনের সব চাইতে নির্ভরযোগ্য, নিশ্চিত ও লাভজনক উপায়।

ঘাস উৎপাদনের খামার ব্যবস্থাপনা একটি সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত প্রযুক্তি, ইহার উদ্দেশ্য, যত বেশী দীর্ঘ সময়ে উন্নতমানের ঘাস সব চাইতে বেশী পরিমাণে ফলানো সম্ভব হয়। বিভিন্ন ঘাসের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য, মাটি ও মাটিতে গাছের খাদ্য উপাদনের বর্তমান অবস্থা ও তার ঘাটতির পরিপূরণ, ফসলের উপর আবহাওয়া জনিত প্রভাব ইত্যাদি ভালভাবে জানা থাকিলে ঘাস উৎপাদনের খামার ব্যবস্থাপনা সহজ হয়।

মৃত্তিকার গঠন ও গ্রথন অনুযায়ী এবং মৃত্তিকা অম্ল বা ক্ষারযুক্ত অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্লটে তৈরী করা, প্লটগুলি উঁচু অথবা নীচু জমি এবং উহার ঢাল অনুসারে সেচের নালা কোন দিক হইতে কোন দিকে নিলে সেচের যথাযথ ব্যবহার হয়, স্যাঁতস্যাতে জলাজমির উন্নতীকরণ ও তাহার ব্যবহার ইত্যাদি সবকিছুই এই মৃত্তিকার ব্যবস্থাপনার মধ্যে পড়ে। দীর্ঘ সময়ের জন্য চাষ বিহীন অবস্থায় জমি ফেলিয়া রাখা উচিত নয়। উপযুক্ত পরিমাণে জৈব সার সঠিক ও সমহারে মাঠে ছড়ানো এবং চাষ দিয়া মাটির সহিত মিশাইয়া দেওয়া, কোন ফসল মাটির কতটা নাইট্রোজেন এবং অন্যান্য খাদ্যপ্রাণ ও খনিজ লবণ নিঃশেষ করে এবং জৈব ও অজৈব সার ও খনিজ উপাদান দিয়া উহার সঠিক পরিপূরণ মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনায় এক বিশেষ প্রযুক্তি। মৃত্তিকাস্থ জল ও গাছের সেই জলের সহজপ্রাপ্যতা এবং অতিরিক্ত জলের নিষ্কাশন ইত্যাদিও মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত বিষয়।

আবহাওয়ার প্রভাব অনুসারে ফসলের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য এবং মৃত্তিকা ও মৃত্তিকাস্থ রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রভাবে ফসলের সহনশীলতা ইত্যাদির সঠিক নির্দ্ধারণ ঘাস উৎপাদনের খামার তৈরীর এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক। স্যাঁত-স্যাঁতে ভিজা জমির জন্য ঘাস, লবণযুক্ত জমির জন্য ঘাস, কাঁকড়যুক্ত পাথুরে মাটির ঘাস, বেলে অথবা এঁটেল মাটির উপযোগী ঘাস, ক্ষার বা অম্লযুক্ত মাটির উপযোগী ঘাস ইত্যাদি। খরায় সহনশীল ও অতি খরায় সহনশীল ঘাস, খরা একেবারেই সহ্য করিতে পারে না এমন ঘাস, ও কিছুমাত্র খরা সহ্য করিতে পারে এমন ঘাস। বায়ুর আদ্রতা বেশী থাকিলে ভাল জন্মায় এমন ঘাস, বায়ুর আদ্রতা কম থাকিলে কোন কোন ঘাস জন্মানোর কোন অসুবিধা হয় না। কোন ঘাসে কত সেচের দরকার, কোন কোন ঘাসে সেচের আদৌ দরকার হয় না আবার কোন ঘাস হাল্কা সেচেও ভাল জন্মায়।

প্রয়োজনভিত্তিক ঘাস উৎপাদনে পদ্ধতিগতভাবে ও পর্য্যায়ক্রমে ঘাসের চাষ প্রথা মানিয়া চলা উচিত। ইহাতে পরবর্তী ফসলের নিশ্চয়তা যেমন বাড়ে তেমন উহা মৃত্তিকার মান সংরক্ষণেও সাহায্য করে। শষ্য জাতীয় ঘাস উৎপাদনের পরে ঐ জমিতে শিম্ব জাতীয় ঘাসের চাষ করা যেমন উচিত তেমন বহুবর্ষব্যাপী ঘাসের ফসল তুলিয়া দিয়াও পর্যায়ক্রমে শিম্বজাতীয় ও শষ্যজাতীয় ঘাসে জমিকে ফিরাইয়া আনা উচিত। এমন ক্ষেত্রে মৃত্তিকাস্থ গাছের খাদ্য উপাদানের ঘাটতি নিরূপন করা ও তাহার পরিপূরণ এক বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য।

ঘাস উৎপাদনে ঘাসের পুষ্টিমূল্য সুবিচনায় রাখা খুবই কর্তব্যের মধ্যে আসে। এইজন্য উন্নততর চাষ পদ্ধতিতে অল্প পুষ্টি ঘাসের সহিত অধিক পুষ্টিকর ঘাসের সংমিশ্রনে চাষ হয়। এমন মিশ্রফসল ঘাসে পুষ্টিমূল্য ও খাদ্যমূল্যমান বাড়াইয়া নেওয়া হয়। শষ্যজাতীয় ঘাসের সহিত শিম্বজাতীয় ঘাসের মিশ্র চাষ চলে যদি উভয় ফসলেরই মৃত্তিকা এবং আবহাওয়াজনিত কারণ ও ঋাতুকাল একই হয়।

উৎপাদিত ফসলে ঘাসের বিভিন্ন পর্যায়ে খাদ্যমূল্যমানের হেরফের ঘটে। কোন কোন ঘাস কচি ও কাঁচা অবস্থায় কাটিয়া গবাদিপশুকে খাওয়ালেই অধিক পুষ্টিমূল্য পাওয়া যায়। আবার সেই ঘাসই ফল ধরিলে ফলের দুধেল অবস্থায় কাটিয়া সাইলেজ করিলে পরিমানেও বাড়ে, আনুপাতিক পুষ্টিমূল্যও পাওয়া যায়। আবার কোন কোন ফসল যখন ফুল বাহির করে তেমন অবস্থায় কাটিয়া গবাদি পশুকে খাওয়াইলে অধিক পুষ্টিমূল্য পাওয়া যায়। তেমন ঘাস হয়তো সাইলেজ করিয়া রাখিবার উপযোগী নহে সুতরাং শুকাইয়া রাখিতে হয়। শুকনো ঘাসের পুষ্টিমূল্য স্বভাবতই কাঁচা ঘাসের চাইতে অনেক কম হয়। আবার চারণভূমির জন্য কোন ঘাস চড়াইয়া খাওয়াইলে অধিক পুষ্টিমূল্য পাওয়া যায় এই সকল তথ্য জানা থাকিলে ঘাস উৎপাদনের খামার হইতে পশুপালনে অধিক লাভবান হওয়া যায়।

চরাইয়া খাওয়াইবার জন্য ঘাস বোনা ও ব্যবস্থাপনা একটু বেশী নজরে রাখিতে হয়। বিজ্ঞানসম্মতভাবে চারণ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য যত বেশী সম্ভব ঘাসের ফলন নেওয়া এবং যত বেশী সংখ্যক পশু তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য তাদের চারণভূমি হইতে পাইতে পারে এবং মৃত্তিকা সংরক্ষণে সহায়ক হয়। কোন কোন ঘাস চারণের জন্য বোনা হয় যাহা একবারই চড়ানো হইয়া থাকে। ঘাসের বাড়ন যখন এমন একটি পর্যায় আসে যখন খাদ্যমূল্যমান গবাদি পশু ও অন্যান্য পশুকে পর্যায়ক্রমে চড়াইয়া খাওয়াইতে হয় এবং এমন ক্ষেত্রে ঘাসের আরো বাড়ন ও ফসল সম্পর্কে বিবেচনাতীত। ঘাস যদি বেশী বড় হইয়া কান্ড শক্ত হইতে থাকে এবং খাদ্যমূল্যমান কমিতে থাকে এমন ঘাসের চারণভূমি গবাদি পশু খুব একটা পছন্দ করে না এবং পুষ্টিমূল্যও ততোটা যোগান থাকে না।

বাহুবর্ষব্যপী ঘাসের যখন নতুন পাতা গজায় তখন যদি বার বার পশুরা চরিয়া খাইয়া নেয় তবে সেই ঘাস মরিয়া যায় কারণ এই বাহুবর্ষব্যপী ঘাস

তাহাদের সালোক সংশ্লেষনের দ্বারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাড়তি খাদ্যও এইভাবে মাটির নিম্নাংশে সঞ্চয় করিয়া রাখে এবং উপযুক্ত আবহাওয়ায় পাতা বাহির করিয়া বাড়ন নেয়। এমন অবস্থায় যদি পশু চরিয়া খাইয়া নেয় তবে গাছ আর বাড়ণ নিতে পারে না। এমন অবস্থা বার বার হইলে সঞ্চিত খাদ্য ক্রমে নিঃশেষ হইয়া যায় এবং পরে ঐ গাছ মরিয়া যায়। সুতরাং চারণভূমিতে বহুবর্ষব্যপী ঘাস তাহার খাদ্য সঞ্চয়ের সুযোগ না পাইতে যেন গবাদি বা অন্যান্য পশু চরিয়া খাইতে না পারে সেই দিকে নজর রাখা উচিত। কিন্তু একবর্ষব্যপী ঘাস তাহার বীজ হইতে বংশবিস্তার করিয়া থাকে এবং চারণভূমির জন্য একবর্ষব্যপী ঘাসের চাষই বেশী হইয়া থাকে।

ঘাস উৎপাদন খামারে চরাইয়া খাওয়াইবার জন্য ঘাসের চাষ ও উৎপাদনের ব্যবস্থাপনা এবং সঠিক ও পদ্ধতিগত ভাবে ঘাসের ব্যবহার করিতে পারিলে খামারের চারণভূমি হইতে সব চাইতে অধিক লাভ পাওয়া সম্ভব হয়। যেমন শিম্বজাতীয় ঘাসের বীজ উপযুক্ত ব্যকটেরিয়া কালচার মিশাইয়া বোনা এবং উপযুক্ত মাত্রায় নাইট্রোজেন সার মাটিতে প্রয়োগে করিলে শিম্বজাতীয় ঘাসের বাড়ন খুবই বেশী হয়, এমন ঘাসে অধিক দুগ্ধবতী গাভীকে চরাইলে দুধের পরিমান বাড়ে। আবার নাইট্রোজেনের পরিমিত ব্যবহারের সহিত ফসফরাস ও পটাশের সঠিক প্রয়োগে শিম্বজাতীয় ঘাসের বাড়ণ কেবল-মাত্র নাইট্রোজেন দেওয়া ঘাসের মত অত বেশী হয় না কিন্তু এমন ঘাসে বাড়ন্ত গবাদি পশু চরাইলে অধিক সুফল আসে। শিম্বজাতীয় ঘাসের সহিত একপত্রবীজ ঘাস মিশাইয়া বুনিলে, উৎপাদিত ঘাসের খাদ্যমানে ক্যালসিয়াম ফসফরাস ও পটাশের পরিমান একক শিম্বজাতীয় ঘাসের চাইতে বেশী হয় এবং প্রোটিন একটা মোটামুটি সমতায় থাকে। এবার কোন শিম্বজাতীয় ঘাসের সহিত কোন একপত্র ঘাসের মিশ্র চাষ চলে, মৃত্তিকা, জলবায়ু, সেচ, ফসলের চরিত্রগত ঐক্য ও বৈশিষ্ট সুসামঞ্জস্য করা এক বিশেষ প্রযুক্তি। ঘাসের মিশ্র চাষ পূর্ববর্তী অধ্যায় বলা হইয়াছে।

বাংলায় আবহাওয়ায় আদ্রতার ভাগ বেশী থাকার একপত্র বীজের ঘাস জোয়ার, ভুট্টা, বাজরা, সুদান ইত্যাদি ঘাসের বাড়ন দ্রুত হয় এবং খরিপ ফসলে গবাদি পশুকে চরাইয়া খাওয়াইবার জন্য ভুট্টা ঘাস মাত্র ৪৫ দিন সময়ের মধ্যে উপযুক্ত হইয়া যায়। আবার পূর্বেই বলা, মিশ্র ফসল জন্মাইতে একটু বেশী সময় নিলেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায় এবং কাঁচ অবস্থায় চরাইয়া খাওয়াইলে কয়েকবারই চরাইয়া খাওয়ানো যায় কেননা তেমন ঘাস

আবার বাড়ন নেয়।

খামারে চরানোর জন্য জমির পরিমান, জাতি ও প্রজাতি অনুযায়ী জমিতে মোট উৎপাদিত ঘাসের পরিমাপ, কত সংখ্যক গবাদি পশু কতদিন ধরিয়া চরিয়া খাইতে পারিবে তাহা হিসাবে রাখা, দুগ্ধবতী গবাদি পশুর সংখ্যা ও দুগ্ধবতী নয় এমন বাড়ন্ত গরু বাছুরের সংখ্যা হিসাবে রাখিতে হয়। কারণ উৎপন্ন ঘাসে প্রথম চারণ দুগ্ধবতী গাভীদের জন্য, পরবর্তী চারণ দুধ না দেওয়া ও বাড়ন্ত গরু বাছুরের জন্য এবং তৃতীয় বাড়ন ভেড়া শুকর ইত্যাদির জন্য। কোন সীমিত পরিমান জমি ৩/৪ বা ততোধিক ভাগে ভাগ করিয়া চাড়ণের জন্য একটি বিশেষ সময়ের ব্যবধানে ফসল বুনিয়া দিলে বোনা ফসলের বাড়ণে একটি ব্যবধান বজায় থাকিবে ফলে দুগ্ধবতী গাভীকে সমস্ত জমিতেই কচি ও কাঁচা ঘাসে দীর্ঘদিন চড়ানো সম্ভব হয়। চারণে বাড়ন্ত গবাদি পশুকেও দীর্ঘদিন রাখা সম্ভব। প্রথম প্লটে বোনা ফসল চড়াইয়া খাওয়াইবার সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় প্লটে বোনা ঘাস চরাইয়া খাওরাইবার উপযোগী হইয়া যাইবে আবার দ্বিতীয় প্লটের ফসল চরাইয়া খাওয়ানোর মধ্যে তৃতীয় প্লটে বোনা ফসল চরানোর মত তৈরী হইয়া যাইবে, এইবার তৃতীয় প্লটে চরাইয়া খাওয়ানোর সময়ের মধ্যে প্রথম প্লটের ঘাস আবার চড়াইয়া খাওয়াইবার মত বাড়ণ নেবে এমনিভাবে যদি সারা বছর চারণভূমিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা বজায় রাখা যায় তবে বিঘা প্রতি জমির সাংবাৎসরিক ফসলে ১.৫ টি দুগ্ধবতী গাভী সারা বছর চরিতে পারে অর্থাৎ ৮ বিঘা জমির ভাল ফসলে ১২টি দুগ্ধবতী গাভী সারা বছর চরিয়া খাইতে পারে। সুষ্টু ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রনে রাখিয়া খামারে চারণভূমির জন্য ঘাসের চাষ ও উৎপাদিত ঘাসে দুগ্ধবতী গাভী প্রতিপালন নিশ্চিত লাভজনক।

ঘাস উৎপাদন খামারে আগাছা নিবারণ একটি জটিল সমস্যা, যে কোনও আগাছা নিমূর্ল করিয়া রাখিতে হইবে। কাটিয়া ফেলা, গর্ত খুড়িয়া তুলিয়া ফেলা, পোড়াইয়া ফেলা, অথবা আগাছা মারিবার ঔষধ ব্যবহায় কয়িয়া, ইহার যে কোন প্রকারে হোক না কেন আগাছা নির্মূল করিয়া রাখিতে হইবে। ঔষধ ছিটাইয়া আগাছা মারা অল্প এলাকার সম্ভব কিন্তু ব্যয় সাপেক্ষ, অন্য যায় জথন মজুরের দাম কম থাকিলে ব্যয় কিছু সাশ্রয় হয় বটে।

অব্যবহৃতে বাহুবর্ষব্যাপী শুকনো ঘাস কাটিয়া আনিতে যে জন মজুরের খরচ তাহা এইড়াইবার জন্য কখোনও কখোনও আগুনে পোড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হয়। যে সমস্ত জমিতে আগাছার উপদ্রব খুবই বৃদ্ধি পায় ঐ সমস্ত ঘাস মাঠেই শুকাইয়া আগুনে পোড়াইয়া দিলে

আগাছার উপদ্রবের হাত হইতে পরবর্তী ফসল রক্ষা পায়। আশ্বিন কার্তিক মাসে আগুনে পোড়াইলে পরবর্তী ফসলের বাড়ন বেশী হয় এবং আগাছা জন্মাইতে পারে না। কিন্তু আগুনে পোড়াইবার পদ্ধতি সকল জমিতেই প্রযোজ্য নহে ও সকল আবহাওয়াতেও প্রযোজ্য নহে। যেখানে বায়ুর আদ্রতা বেশী বৃষ্টিপাতের অনুপাত বেশী সেইসমস্ত অঞ্চলে আগুনে পোড়ানো প্রথা তেমন ক্ষতিকর হয়না কিন্তু যেখানে আবহাওয়ায় আদ্রতা কম এবং বৃষ্টিপাতের অনুপাত কম তেমন অঞ্চলে আগুনে পোড়ানো প্রথা অবশ্যই ক্ষতিকর। বাহুবর্ষব্যাপী ঘাসের বীজ বায়ুতাড়িত হইয়া সমস্ত খামারে ছড়াইয়া পড়িতে না পারে সেইজন্য ব্যবহার অনুপোযোগী ঘাসও পোড়াইয়া ফেলা হয়। অনেক সময়ে বোনা ফসলের চাইতেও আগাছা দ্রুত জন্মায়, ফল ধরে ও পাকে এবং মাটিতে ঝরিয়া পড়ে এমন ক্ষেত্রে বোনা ফসল হইতে আগাছা নিড়াইয়া ফেলাই নিরাপদ।

ঘাস উৎপাদনে পোকা মাকড়ের উপদ্রব এক বিশেষ সমস্যা। চিবিয়ে খাওয়া পোকা মাকড় আর চুষিয়া খাওয়া পোকা মাকড় এই দুয়েরই উপদ্রব প্রবল আকারে দেখা দিলে ফসল রক্ষা করা অসম্ভব হয়। তার মধ্যেও চুষিয়া খাওয়া পোকামাকড় আরো বেশী মারাত্মক হয়। ইহারা গাছের পাতার সবুজ অংশ (ক্লোরোফিল) চুষিরা খাইয়া নেয় এবং এমন পোকা ব্যপক আকারে দেখা দিলে রাতারাতি মাঠের ফসল নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। ব্যাপক আকারে দেখা দিলে যে কোন পোকা মাকড়ই নিয়ন্ত্রণে আনা প্রায় অসম্ভব এবং নিয়ন্ত্রণে আনিবার সময়ের মধ্যে মাঠ প্রায় নিঃশেষ হইয়া যায়। সুতরাং বোনা ফসলে নজর রাখিতে হয়, এবং প্রথম দেখা দিলেই পোকা মাকড় মারিবার ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়। প্রথম অবস্থায় ঔষধ ব্যবহার করিলে পোকা মাকড়ের সংখ্যা আর বাড়িতে পারেনা। গবাদি পশু বা অন্যান্ন পশু খাদ্য ঘাসে পোকা-মাকড় মারিবার ঔষধ ব্যবহার করিলে ঐ ঘাস গরু বাছুরকে সঙ্গে সঙ্গে খাওয়াইতে নাই।

ঘাসে কীটনাশক বিষ ব্যবহার করিতে হইলে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই স্পর্শ বিষ (কন্ট্যাকট পয়েজন) ব্যবহার করা উচিত। কেননা স্পর্শবিষের প্রভাব অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই কমিয়া আসে এবং পরে আর থাকেনা। বৃষ্টি পাইয়া গেলে এবং শীতের দিনে বেশী কুয়াশা হইতে স্পর্শবিষের প্রভাব নষ্ট হইয়া যায়। গাছের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এমন কীটনাসক বিষ (সিস্টেমিক পয়েজন) ব্যবহার করিলে ঐ ঘাস গবাদি পশুকে না খাওয়ানোই উচিত তবে

শষ্যদানা বা বীজের জন্য ঐ ফসল রাখা চলে এবং ঐ ঘাস খড় করিয়া গরু বাছুরকে খাওয়ানো যায় তখন আর তেমন বিষক্রিয়া থাকে না। এই বিষে যে কোন ধরণের পোকা-মাকড়ই হোক না কেন তা অবশ্যই মরে। কারণ এই বিষ গাছের আভ্যন্তরীন প্রক্রীয়ার সহিত মিশিয়া যায় সেইজন্য শোষক পোকাই হোক আর চিবাইয়া খায় এমন পোকাই হোক না কেন মরবেই। এই বিষ প্রক্রীয়া বেশ কিছুদিন গাছে বর্তমান থাকে। পরে ক্রমান্বয়ে নষ্ট হইয়া যায়। পোকা-মাকড় সাধারণত গাছের পাতার নিম্নাংশে এবং কান্ডের সহিত মূলপত্রের সংযোগস্থলে (একপত্রবীজ ঘাসে) যেখানে সূর্য্যালোক বা তাপ পেঁছায়না তেমন জায়গায় প্রচুর সংখ্যক ডিম পাড়ে, ঐ ডিম হইতে লারভা বা হর হয়, তখন হইতেই গাছের রস শোষণ করিতে থাকে এবং আরও একটু বড় হইয়া শুঁয়োপোকায় পরিণত হয়। বিভিন্ন জাতের পোকা মাকড়ের এই শুঁয়ো অবস্থাই বেশী মারাত্মক কারণ ইহারা চলিতে পারে। এক গাছ হইতে অন্য গাছে গিয়া সারা মাঠে ছড়াইয়া পড়িতে পারে। জাতি ও প্রজাতি অনুযায়ী ইহারা শোষক ও চিবাইয়া খায়। শুঁয়োপোকা অবস্থায় স্পর্শবিষ ভাল কাজ দেয় বটে কিন্তু বিষ ছিটাইবার সময় ইহারা পাতার তলায় গিয়া অথবা মাটিতে পড়িয়া গিয়া আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করে। সুতরাং ইহারা যদি একবার সংখ্যায় বাড়িয়া যায় স্পর্শবিষ স্প্রে করিয়া বা গুঁড়া বিষ ছিটাইয়া ইহাদের নির্মূল করা যায়না। ঐজন্য বোনা ফসলে নজর রাখিতে হয়। পূর্ণাবয়ব কীট, পোকা-মাকড় দুই চারটি দেখা দিলেই মনে করা উচিত ইহারা (মথ) ফসলে কোথাও না কোথাও ডিম পাড়িয়াছে। তখন প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে স্প্রে পদ্ধতিতে স্পর্শবিষ ফসলে দিয়া দিলে ডিম ফুটিয়া লারভা জন্মাইতে পারেনা বা জন্মাইয়া থাকিলেও মরিয়া যায় ফলে প্রাদুর্ভাব ঘটিতে পারেনা।

জোয়ার ঘাসে স্টেমবোরার নামক কীটের উপদ্রব দেখা দেয়। এই কীট উপর হইতে ছিদ্র করিয়া গাছের ভিতরে ঢুকিয়া যায় এবং ভিতর হইতে উপরের বাড়ন্ত পাতা বা ডগ পাতাটিকে নষ্ট করিয়া দেয়। এই পোকা স্পর্শ বিষ দিয়া মারা যায়না কেননা ইহারা গাছের অভ্যন্তরে আত্মগোপন করিয়া থাকে। এমন ক্ষেত্রে আক্রান্ত গাছ তুলিয়া পোড়াইয়া ফেলা উচিত। গাছে যখন ফল ধরিতে আরম্ভ করে তখন এক ধরণের শোষক পোকা শষ্যদানার ভিতরের রস শুষিয়া খাইয়া ফেলে। ২%ডি. ডি. টি অথবা বি. এইচ, সি, ছিটাইয়া দিলে

ভাল ফল পাওয়া যায়। কখনও কখনও হুড়চোঙ্গা পোকা এবং লেদা পোকা কচি জোয়ার ঘাসে দেখা যায়। ভুট্টা গাছের খুব চারা অবস্থায় স্টেম বোরারের প্রাদুর্ভাব হয়। ইয়ারওয়র্ম নামক মথ এর শুঁয়োপোকা ভুট্টা ঘাসের ক্ষতির কারণ হয়। হুড়চোঙ্গা পোকা ও শোষক পোকার উপদ্রবও ভুট্টা ঘাসে হয়। আধুনিক কীটনাশক ঔষধে এই সমস্ত কীট পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। বারসীম ফসলে শুঁয়োপোকার উপদ্রব হয়। সাধারণত অগ্রিম বোনা ফসলেই এই শুঁয়োপোকার উপদ্রব দেখা যায়। আক্রমণের প্রথম অবস্থায় ঘাস কাটিয়া গরু বাছুরকে খাওয়াইয়া দিতে হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে সেচের জল দিয়া দিতে হয়। আশপাশের আগাছা নির্মূল করিয়া দিতে হয় এবং জমির চারিদিকের আইল ছাঁটিয়া পরিষ্কার করিয়া দিয়া পুনরায় ঘাস বুনিয়া দিতে হয়। যদি ঘাস খুবই কচি অবস্থায় প্রথম কাটিংসএর আগে আক্রান্ত হয় তবেই পুনরায় বীজ বুনিতে হয় আর যদি প্রথম কাটিংস নিবার পরে আক্রান্ত হয় তবে বীজ না বুনিলেও চলে। সেচের জল দিয়া দিবার পরে ঐ কাটা ঘাসই আবার বাড়ন নিবে। লুসার্ণ ঘাসে বিভিন্ন প্রকার হুড়চো চাঙ্গা পোকা ও শোষক পোকা গাছের রস শুষিয়া খাইয়া নেয় ফলে গাছ বাড়িতে পারেনা ও পাতা হলদে হইয়া যায়। এই সব কীট পতাঙ্গ মারা খুবই কষ্টের, কারণ ঔষধ প্রয়োগ করিবার সময় শুঁয়োপোকা পাতার তলায় গিয়া আশ্রয় নেয় আর পূর্ণাবয়ব মথ কীটনাশক ঔষধে প্রায়শঃ মারা যায়না। লুর্সান উইভিল নামক পোকার লার্ভা ব্যাপকভাবে দেখা দিলে ফসল রক্ষা করা খুবই কঠিন হইয়া পড়ে, গাছ বাড়নহীন হইয়া পড়ে এবং ফসল খুবই কম হয়। কীটনাশক ঔষধ এনড্রিন, ডায়ালড্রেন ও এনড্রিন বিঘাপ্রতি ৬-২৪ গ্রাম ঔষধ ৮-৩০ লিটার জলে মিশাইয়া স্প্রে করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। ক্লোরডেন, টক্সাফেন ও বি. এইচ. সি প্রয়োগেও হুড়চোঙ্গা পোকা ও শোষক পোকায় ভাল ফল পাওয়া যায়। বরবটি খরিপে চাষ করিলে শোষক পোকার উপদ্রব দেখা দিতে পারে, এমন অবস্থায় ফসল কাটিয়া গবাদি পশুকে খাওয়াইয়া দিয়া দিতে হয় এবং পরবর্তী বাড়ন নেওয়া ফসলে প্রতিশেধক ব্যবস্থা হিসাবে কীটনাশক ঔষধের একটি হাল্কা স্প্রে দিয়া দিলে ফসল পুনরায় আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। বরবটি ঘাসে শুঁয়োপোকার আক্রমণ মারাত্মক ক্ষতি করে। ইহা কচি পাতা খাইয়া নেয়। ব্যাপকভাবে শুঁয়োপোকা দেখা দিলে ফসল বাঁচানো সম্ভব হয়না। প্রথম মথ দেখা দিলেই প্রতিশেধক হিসাবে ঔষধ স্প্রে করানো উচিত। মটর ঘাসে হালকা সবুজ রঙের এক ধরণের শোষক পোকা দেখা যায়। ইহারা গাছের

রস শ্বষিয়া খাইয়া নেয়, ফলন খ্বই কম হয়। গাছে ফুল ধরিবার সময় প্রচুর মথ দেখা যায়। ফসল অগ্রিম ব্নিলে এই মথের উপদ্রব থাকে না।

ঘাস চাষে পোকা মাকড়, কীট পতঙ্গের হাত হহতে রক্ষা পাইতে হইলে কীট পতঙ্গের বসবাসের বা বংশবিস্তারের উপযোগী আশ্রয়গ্বলি নির্ম্বল করিয়া রাখা উচিত। কোন কীট পতঙ্গ কোথায় আশ্রয় নেয় তাহাও সম্যক জানা থাকা দরকার। কোন কোন কীটপতঙ্গ চাসের জমির কাছাকাছি উপযোগী আগাছায় আশ্রয় নেয় আবার কোন কোন কীটপতঙ্গ পচা গোবর ও আবর্জনায় ডিম পাড়ে। এইজন্য খামারে আগাছা নির্ম্বল করিয়া রাখা দরকার। জমির আইল ছাঁটিয়া পরিস্কার রাখা উচিত। পচাগোবর ও আস্তাকুঁড়, ছায়া ঘেরা গাছ ইত্যাদি যেন চাষের জমির কাছাকাছি না থাকে। চাষের ফসলে নজর রাখা দরকার মথ অথবা প্র্ণবয়ব বিয়ব কীট প্রথম দেখা গেলেই সাবধানতা অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য।

পোকা মাকড়ের ক্ষতি হইতে ফসলকে রক্ষা করিতে যে সমস্ত বহ্বল প্রচারিত ঔষ্ধ ব্যবহৃত হয় তাহার ব্যবহার বিধি সম্বলিত তালিকা দেওয়া হইল।

ঘাসে পোকা মারার ঔষধ ও মাত্রা

ঔষধের নাম	ঔষধের পরিমাণ প্রতি ১০ লিটার জলে	প্রতি বিঘায় ঔষধ ১০০ লিটার জলে
১	২	৩
মেটাসিস্টক্স্	১০ মিলি	১০০ মিলি
রোগর	১০ মিলি	১০০ মিলি
প্যারাথিয়ন	১০ মিলি	১০০ মিলি
থায়োডন্	১৫ মিলি	১৫০ মিলি
লিন্ডেন	২০ মিলি	২০০ মিলি
এনড্রিন	১৫ মিলি	১৫০ মিলি
ম্যালাথিয়ন	১৫ মিলি	১৫০ মিলি

বিভিন্ন ঘাসের রোগ ও প্রতিশোধক ঔষধ

জোয়ার ঘাসের রোগের মধ্যে স্মাট-রোগই সব চাইতে ক্ষতিকারক হয়। ইহা একটি বীজ সংবহ রোগ কাজেই বীজ বোনার আগে সালফার দিয়ে বীজ শোধন করিরা নিলে এই রোগের সম্ভবনা থাকে না। ২৮ গ্রাম সালফার ডাণ্ট প্রায় ৭ কে.জি. বীজ শোধন করিতে পারে। ইহা ছাড়াও বাজারে বীজ শোধনের জন্য বিভিন্ন ওষুধ বিভিন্ন নামে কিনিতে পাওয়া যায় এবং ঐ ঔষধে মানুষের কোন ক্ষতির আশংকা নেই।

আর এক ধরণের রোগ লুস্মথাট এই জোয়ার ঘাসকে আক্রমণ করে এবং ব্যাপকভাবেই করে। এই রোগের আক্রমণে গাছের বাড়ন নেয় না, খর্ব্ব হয়ে থাকে,—কোন ফলন বের করতে পারে না কাজেই এমন ঘাস কাচা হিসাবে গো খাদ্যে মান অনেকভাবে কমে যায়। বীজশোধন ঔষধ ব্যবহার করাই ইহার একমাত্র প্রতিশেধক।

হেডস্মাট নামক রোগ জোয়ারকে ফুল আসার অবস্থায় আক্রমণ করে। ইহা বীজ সংবহ রোগ নহে। মৃত্তিকা হইতে এই রোগের জন্ম, কাজেই এমন রোগে আক্রান্ত গাছকে উপরাইয়া তুলিয়া ফেলাই উচিত।

লংস্মাট নামক রোগ জোয়ারের ফলকে আক্রমণ করে। ইহা বায়ুসংবহ রোগ। অগ্রিম বোনা ফসলে এমন রোগ সাধারণত দেখা দেয় না।

ইহা ছাড়াও জোয়ার ঘাসে আরও রোগ হয় যেমন লিপব্লাইট, এ্যানথ্রাকনোজ এবং ব্লাইট রোগ। যখন জোয়ার ঘাস অতি বৃষ্টির সময় জন্মানো হয় তখনই এই রোগগুলি সাধারণতঃ পরিলক্ষিত হয়।

ডাঁনিমিলডিউ রোগ জোয়ার ঘাসে প্রায়ই দেখা যায়। উহা মৃত্তিকা সংবহ রোগ। এই রোগে চারা গাছের মাইজ পাতা হলদে হয়ে যায় এবং পরে প্রায় বাদামি রং হয়ে আসে, গাছে বাড়ন নেয় না। এমন আক্রান্ত গাছ শুকিয়ে যাওয়ার আগেই তুলিয়া ফেলা উচিত ও পোড়াইয়া দেয়া উচিত।

ষ্টিগা নামক এক প্রকার ফ্যানারোগামিক প্যারাসাইট মাটিতে নিস্তেজ অবস্থায় থাকে উহা জোয়ারের বোনা বীজের সঙ্গে বাড়তে শুরু করে এবং গাছের শিকড়কে আক্রমণ করে। এমন অবস্থায় গাছ বাড়ন নিতে পারে না এবং শ্রীহীন হইয়া পড়ে। সময় মত 2, 4—D কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার করিতে পারিলে ফসল বাঁচানো অনেকটা সম্ভব হয়।

ভুট্টা গাছেও রোগ হয় যেমন (১) লিপব্লাইট (২) রাষ্ট (৩) ষ্টক ও ইয়ার রট্ এবং (৪) ডনি মিলডিউ। অবশ্য এই সমস্ত রোগই উত্তর ভারতের পাহাড়ী অঞ্চলে দেখা যায়। আর এই সকল রোগের কোনও ঔগধ ব্যাবহৃত হয় না। রোগপ্রতিরোধক্ষম প্রজাতির বীজ বোনাই বিধেয়।

ওটস ঘাসের রোগের মধ্যে রুটরট রোগ মারাত্মক। এছাড়াও কোলে-টোট্রিকাম গ্রামিনিকোলা একপ্রকার ফাংগসে রোগ হয়। মাটি অম্লযুক্ত নয় এবং ক্ষারযুক্ত জমির ফসলেই এই সকল রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী দেখা যায়। এর কোন প্রতিশোধক ঔষধ তেমন ব্যাবহৃত হয় না তবে সঠিক ক্রপ রোটেশন, সময়মত বোনা, বীজ খুব মাটির তলায় দিয়ে না বোনা—কেবল হাল্কা মাটি চাপা দিয়ে বোনা যেন অংকুরোদগম হয় এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিমছাম চাষ করাই এই রোগের প্রতিরোধ। রাষ্ট রোগও ওটস ঘাসের বেশ ক্ষতি-কারক ও সংক্রামক। গরম আদ্র আবহাওয়া, অতিবৃষ্টি ও এবং দীর্ঘ সময় কুয়াশা এই রোগ ছড়ানোতে খুবই সাহায্য করে। কীটনাশক ঔষধ ব্যবহারে এই রোগ নিয়ন্ত্রণে আনা অনেকটা সম্ভব যদি এই রোগ দেখা দেবার লক্ষন দেখিলেই প্রথম অবস্থায় কীটনাশক ঔষধ ব্যাবহার করা হয় তবেই কেবলমাত্র নিয়ন্ত্রণ রাখা সম্ভব হয়। স্মাট রোগও ওটসের বিশেষ ক্ষতিকারক। ওটস বীজের অংকুরোদগমের সঙ্গেই এই স্মাট রোগ জন্মাতে শুরু করে এবং গাছের ক্ষতি করতে থাকে। এই রোগ নিয়ন্ত্রণ করা খুব কঠিন নয়। বীজ শোষণ ঔষধ আরাসন, স্পারগন, দো-৯-বি, এবং ডায়াথেন ২ গ্রাম প্রতি কেজি বীজ শোধনের জন্য ব্যাবহার করিলে এই স্মাট রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়।

বারসীম ঘাসের স্টেম রট রোগ মারাত্মক। উহা অংকুরোদ্গমের সময় আক্রান্ত হয় এবং অংকুর অবস্থায় মরে যায়। এ রোগের কার্যকরী প্রতিরোধ নেই বলিলেই চলে তবে উত্তম জলনিষ্কাশনযুক্ত ব্যাবস্থায় উত্তম চাষ ও বীজ বপনে অনেকটা এই রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। রট রোগ বারসীমের এক মারাত্মক রোগ। এই রোগ একবার দেখা দিলে ফসল কাটিয়া ফেলাই ভাল ইহা ব্যাতিত ভিন্ন কোনও প্রতিরোধ নেই। বারসীম বীজ বোনার আগে ভালভাবে দেখিয়া লইতে হয় যেন বারসীম বীজের সংগে ডডারবীজ, চিকোরী বীজ বা ভিন্ন কোন বীজ মেসানো না থাকে। যদিও বা দু'একটা বীজ থেকেও যায় চারা বাহির হইবার পরে উহা খুবই সতর্কতার সহিত টানিয়া তুলিয়া ফেলিতে হয় এবং সতর্কতার সহিত বারসীম মাঠের দূরে নিয়া

আগুনে পোড়াইয়া ফেলাই উচিত।

লুসার্ন ঘাসে ব্যাকটেরিয়াল উইল্ট একটা মারাত্মক রোগ। আক্রান্ত গাছ খর্ব্বাকৃতি হয়ে থাকে আর অস্বাভাবিকভাবে একগুচ্ছ কাণ্ড গজায়। পাতাগুলি ফ্যাকাসে সবুজ হয়ে আসে। কেবলমাত্র এই রোগ প্রতিরোধক্ষম বীজ ব্যবহার ছাড়া এই রোগ প্রতিরোধ সম্ভব নহে। লুসার্ন ঘাসে আর একটা রোগ লিপস্পট ব্যাপক আকারে দেখা দেয়। ইহা এক ধরণের ফাংগাস রোগ। পাতার ওপর গোল গোল গাঢ় বাদামি থেকে কালো রংয়ের দাগ হয় এবং আক্রান্ত গাছ হলদে হয়ে পাতাগুলো ঝরে যায়। এমন আক্রমণ শুরু হওয়ায় সংগে সংগে সমস্ত ফসল কাটিয়া গবাদি পশুকে খাওয়া ইয়া দেওয়াই ভাল।

গাছের রোগের ঔষধ

তামা ঘটিত ঔষধ,—(১) ব্লাইটক্স (২) ফাইটেলোন। বিঘা প্রতি ২৫০ গ্রাম যে কোনও একটি ঔষধ ৬৫ লিটার জলের সংগে মিশাইয়া লইতে হয়, অথবা কাঠা প্রতি ৩ লিটার জলের সংগে ১২ গ্রাম ঔষধ মিশাইয়া লইতে হয়।

দস্তাঘটিত ঔষধ ঃ—(১) হেক্সাথেন (২) ইউনিজেব ও (৩) ডাইথেন জেড। বিঘা প্রতি ১২৫ গ্রাম যে কোনও একটি ঔষধের সহিত ৬৫ লিটার জলের সংগে মিশাইয়া লইতে হয়। অথবা কাঠা প্রতি ৩ লিটার জলের সংগে ৬ গ্রাম ঔষধ মিশাইয়া লইতে হয়। স্প্রে করিয়া সারা মাঠে এই সকল ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়।

বীজসংবহ রোগবীজানু নষ্ট করিয়া যদি বীজ বোনা যায় তবে ঐ সকল রোগ হইতে ফসল রক্ষা করা সম্ভব। এইজন্য বীজ বুনিবার পূর্ব্বে বীজকে রোগ প্রতিশোধক ঔষধ ব্যবহার করিয়া শোধন করিয়া লইতে হয়। গুড়ো ঔষধ হেক্সাথেন, এগ্রোসেন জি, এন, এবং সেরেসান্ ইহার যে কোনও একটি ঔষধের ৫ গ্রাম ১ কে.জি বীজের সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে নিলেই বীজ শোধন হয়। আবার জলে গোলা ঔষধ টাফানল, ১½ গ্রাম ডাইথন জেড্—৩ গ্রাম এবং এরাটন—৬, ১½ গ্রাম ইহার যে কোনও একটির নির্দিষ্ট পরিমাণ ঔষধ ১½ লিটার অল্প উষ্ণ জলে গুলিয়া বীজগুলি ইহার মধ্যে ডুবাইয়া শোধন করিয়া লইতে হয়। এইভাবে বীজ শোধন করিয়া বুনিলে বীজসংবহ রোগের সম্ভাবনা থাকে না।

ঘাসের বীজ উৎপাদশ ও সংরক্ষণ

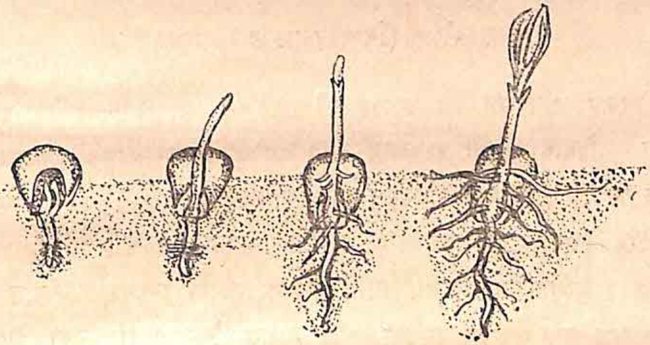
গাছ বংশ বিস্তারের জন্য ফলের মধ্যে বীজ উৎপন্ন করে ইহা প্রকৃতিগত বিধান। বীজের মধ্যে ভ্রূন সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং ভিন্ন ভিন্ন বীজের সুপ্তিকাল বিভিন্নভাবে সংক্ষিপ্ত অথবা দীর্ঘ হয় এবং উহা গাছের জাতি ও প্রজাতিগত ব্যাপার। ব্যহ্যিক বীজ সংরক্ষণের উপযুক্ত পরিবেশের অভাব ঘটিলে ভ্রূনের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে ফলে সকল অবস্থায় অংকুরউদ্‌গম হইতে চাহে না আবার কখনও কখনও ভ্রনের মৃত্যুও ঘটে এবং তেমন বীজ বংশ বিস্তারের জন্য অনুপযোগী হইয়া পড়ে। কৃষিতে বীজের অংকুউদ্‌গম ক্ষমতা পরিক্ষা করা এক বিশেষ পদ্ধতি এবং আবশ্যিক, কেননা বোনার জন্য বিঘা প্রতি বীজের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া দিবার সময় উহা হিসাবে আনিতে হয়। মনে করুন এক বিঘা জমিতে কোনও ফসলের বীজ বুনিবার জন্য ৩ কে.জি ভাল বীজের দরকার হয়। ভাল বীজের অংকুরউদ্‌গম ক্ষমতা শতকরা ৯৬-৯৯ ভাগ হওয়া দরকার। উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে কোনও বীজ যদি শতকরা ২৫ ভাগ অংকুরউদ্‌গম ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে তবে তেমন বীজ দিয়া এক বিঘা জমি চাষ করিতে ৩ কিলোর পরিবর্ত্তে ৪ কিলো বীজের দরকার হয়। ৪ কিলো তেমন বীজে এক বিঘা জমি চাষ করিলেও অনুপযোগী সংরক্ষণজনিত ব্যাঘাত ও প্রভাব অংকুরউদ্‌গমক্ষম কিছু সংখ্যক বীজের উপর তথাপিও থাকিয়া যাইতেছে, তাহারা স্বাভাবিক সুস্থ-সবল গাছে পরিণত হয়ী না। সুতরাং কৃষিতে পরিস্কন্ন সুষ্ঠ্য স্বাভাবিক বীজ উৎপাদন যেমন আবশ্যক তেমন যথোপযুক্তভাবে বীজ সংরক্ষণও অবশ্য কর্ত্তব্য।

জাতি ও প্রজাতির বিশুদ্ধতা বজায় রাখিয়া কৃষিতে পরবর্ত্তী ফসলের জন্য সুষ্ঠ্য সবল বীজ উৎপাদন করা এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বিশুদ্ধ পরিপুষ্ট বীজ উৎপাদন করিতে হইলে কতগুলি বিশেষ নিয়ম মনে রাখা দরকার। পরিচ্ছন্ন বীজ বলিতে সংবহ রোগবীজাণুমুক্ত থাকা, বীজের সংগে ভিন্ন প্রজাতির বীজ না থাকা, বীজের সংগে ধুলা বালি মাটি পাথর বা অন্য

ও অবাঞ্ছিত পদার্থ না থাকা, বীজের স্বাভাবিক ও সম্পূর্ণ অংকুরউদ্‌গমের ক্ষমতা বজায় থাকা, বীজের সংকরমুক্ত অবস্থা এবং নিজস্বতা বজায় থাকা, প্রতিটি বীজের আকার ও ওজনের সমতা থাকা, এবং পূর্ববর্তী ফসলের পরিচর্য্যার অভাবজনিত অথবা প্রকৃতিগত কারণে চরিত্রের অধোগতি এবং এই অধোগতি জনিত ফলনশীলতায় নিম্নগতি এই সমস্ত কিছুই বিচার্য্য বিষয়ের মধ্যে আসিয়া যায়।

খামারে পরবর্তী চাষের জন্য প্রয়োজন মত ভাল বীজ উৎপাদন করিবার জন্যই যদি শষ্য জাতীয় ও শিম্ব জাতীয় ঘাসের ফসল চাষ করিতে হয় তাহা হইলে আবাদ প্রণালীর বিশেষ বিশেষ নিয়মগুলি মানিয়া চলা উচিত।

কত বীজ উৎপন্ন করিতে হইবে, কাঠা প্রতি সেই বীজের ফলন কত হয় হিসাব করিয়া কতটা জমিতে ফসল বুনিতে হইবে ঠিক করিয়া সেই ফসলের জন্য উপযুক্ত মৃত্তিকার প্লট বেছে নিন। নির্দ্দিষ্ট প্লটের আশে পাশে পচা ডোবা, পচা গোবর, অথবা ঝোপ জংগল না থাকে সেইদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার কারণ কীটপতংগ পোকামাকড় ইত্যাদির বাসা করা ও ডিম পাড়ার

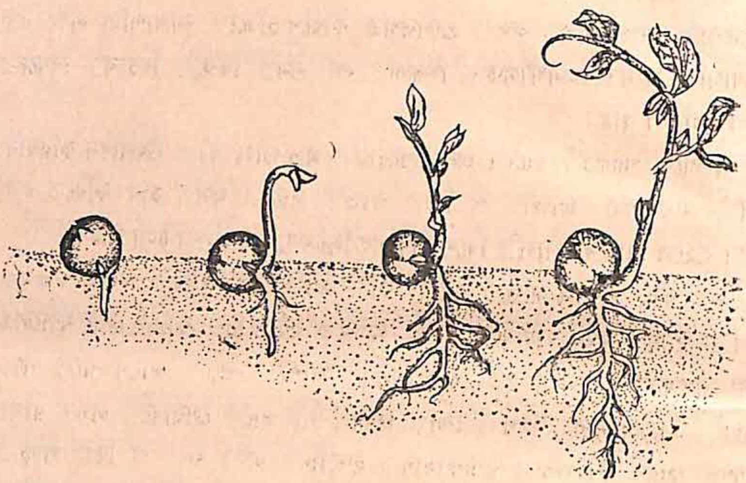


এক পত্র বীজের (ধান্য গোত্রীয়) অংকুরোদ্গম

জায়গা ঐগুলিই হয়। জমিকে আগাছা মুক্ত করিয়া নিন এবং আইলের চারিদিক ছাটিয়া পরিষ্কার করিয়া নিয়া উপযুক্ত পরিমাণে সার দিয়া চৌরষ করিয়া জমি তৈরী করুন। বীজ সংবহ রোগ বীজাণু না থাকে এইজন্য বীজকে শোধন করিয়া লইতে হয়। লাইনে বীজ বুনুন। লাইনে লাইনে ব্যাবধান এবং গাছে গাছে ব্যবধান ভিন্ন ভিন্ন ফসলের ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে।

জমিতে বীজ বুনিবার সময় মাটিতে রস কেমন আছে লক্ষ্য রাখিতে হয় কারণ বীজের অংকুরউদ্‌গমের জন্য জল এক অবশ্য সর্ত্ত। জল বীজের

মধ্যে সুপ্ত ভ্রূনকে জাগ্রত করে এবং অংকুরউদ্‌গমে সাহায্য করে। বিভিন্ন বীজের সর্ত্ত মানিতে কম বেশী জলের প্রয়োজন হয়। শক্ত আবরণযুক্ত বীজে



দ্বিপত্র বীজের (শিম্বী গোত্রীয়) অংকুরোদ্গম

বেশী জলের প্রয়োজন হয় আবার দ্বীপত্রবীজের খাদ্যভান্ডার বড় হইলেও উপযুক্ত পরিমাণ জলের প্রয়োজন হয়। বীজ থেকে অংকুরউদ্‌গমের জন্য মাটিতে পর্য্যাপ্ত ও উপযুক্ত পরিমাণে রস থাকা দরকার।

লাইনে উপযুক্ত ব্যবধানে বীজ বোনায় গাছের পরবর্ত্তী পরিচর্যা খুবই সহজ হয়। আগাছা মুক্ত রাখা, মাটি হাল্কা করিয়া দেওয়া, উপযুক্ত সময়ে পরিমান মত সার ও সেচ দেওয়া, কীট নাশক ঔষধ ব্যবহার করা ইত্যাদি। উপযুক্ত ব্যবধানে লাইনে বোনার দরুন ফলনীশীলতার উপর নজর রাখাও সহজ যেমন ফুল আসার পর থেকে ফল ধরা পর্যন্ত এবং বীজ পাকিবার সময়কাল নির্দ্ধারণ করিয়া ফসল তুলিয়া আনা এবং ফলন না তোলা পর্যন্ত কীট পতঙ্গ ও পাখীর হাত হইতে রক্ষা করা ইত্যাদি।

যে সমস্ত গো-পালকদের খামার ভিত্তিক গবাদিপশু পালন নয় তাহারা ঘাসের বীজ উৎপাদনের জন্য জমির ব্যবহার ও শ্রম স্বীকার করিয়া বীজ উৎপাদন করিতে চাহিবে না আবার প্রান্তিক গো-গালক ও চাষিদের অধিকাংশই বীজের প্রয়োজন পরিমান এতই অল্প যে তাহারা বীজ উৎপাদনের কথা চিন্তাই করিবেন না। বীজ কিনিয়া তাহারা তাহাদের অল্প পরিমান জমিতে ঘাসের চাষ তুলিয়া লইবেন।

তথাপিও আপন আপন চাষ হইতে ছিটাইয়া বোনা ফসল থেকে শষ্য জাতীয় ও শিম্ব জাতীয় ঘাসের বীজ তুলিয়া নেওয়া সম্ভব যেমন ভূট্টা, জোয়ার, টিউসিনটি, ওটস্, মটর, বরবটি, গহিমুগ, ও বিশালমুগ ইত্যাদি। ঘাসের জন্য ছিটাইয়া বোনা ফসল থেকেও বীজ সংগ্রহ করা সম্ভব কিন্তু সতর্কতার সঙ্গে উহা করিতে হইবে কারণ ছিটাইয়া বোনা বীজের গাছের পরিচর্য্যা লাইনে বোনা বীজের ফসলের মত হয় না ফলে গাছের শারীরবৃত্তীয় ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব অনুসারে উহাদের বৃদ্ধি, ফলন ও ফলনের উৎকর্ষতায় বিশেষ তারতম্য ঘটিয়া থাকে। বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে লাইনে বোনা ফসলের বীজের মান এর মত এই বীজ হয় না।

ঘাসের জন্য ছিটাইয়া বোনা ফসল হইতে যদি বীজ সংগ্রহ করিতে হয় তবে নাবী ফসলের ফলন থেকেই বীজ সংগ্রহ করা উচিত যেমন শ্রাবণ—ভাদ্র মাসে বোনা জোয়ার ও বরবটি ঘাসের ফল আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে পাকে, আশ্বিন মাসে বোনা গহিমুগের ফল পাকে মাঘ মাসে। ছিটাই বোনা ফসলের যে অংশ গাছের বাড়ন সুষ্ঠ হইয়াছে, ফুল ও ফলন স্বাভাবিক হইয়াছে তেমন অংশ রাখিয়া দিয়া মাঠের বাকী বোনা ফসল ঘাস উপযুক্ত হইলে যখন যেমন প্রয়োজন কাটিয়া গবাদি পশুকে খাওয়াইয়া দিতে হয়। বীজের জন্য যে অংশটুকু নির্দ্ধারিত রহিয়াছে তাহার পরিচর্য্যা উত্তমরূপে হওয়া আবশ্যক যেমন আগাছা মুক্ত রাখা পাশাপাশি কম বাড়ন্ত বা বীজ নেওয়ার অনুপযোগী ঘাস কাটিয়া গবাদি পশুকে খাওয়া দেওয়া, প্রয়োজন অনুসারে সেচ ও সার দিয়া পরবর্ত্তী পরিচর্য্যা করা, কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার করা ও পাখীদের হাত থেকে বীজ রক্ষা করা, উপযুক্ত পরিপক্ক অবস্থায় বীজ তুলিয়া আনা ইত্যাদি।

ছিটাইয়া বোনা ফসলের সব চাইতে সুষ্ঠ সবল ফল সহ গাছ চিহ্নিত করিয়া রাখিয়া বাকী ফসল ঘাস সময় উপযোগী গবাদি পশুকে খাওয়াইয়া দেওয়া চলে। এই পদ্ধতিতে শষ্য জাতীয় ঘাস ভূট্টা, জোয়ার, টিওসিনিট ওটস্ ইত্যাদির বেলায় সম্ভব কিন্তু শিম্বজাতীয় ঘাসে বীজের জন্য গাছ পৃথকীকরণ পদ্ধতি চলে না। কারণ শিম্বজাতীয় একই গাছে ফলের ছড়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পরিপাক্ক হয়। অসম পরিপক্কতার জন্য যখন পরিপক্ক ফলের ছড়া ফাটিয়া বীজ মাটিতে ঝড়িয়া পড়িতে থাকে তখন একই গাছে অপর অপরিপক্ক ছড়াগুলি উপযুক্ত হওয়ার জন্য আরও অনেক সময় বাকী থাকে। শিম্ব জাতীয় ঘাসের বীজে অসম পরিপক্কতা অনেকাংশে কমাইয়া আনা সম্ভব। বোনার সময় বীজ নির্দ্ধরণ করা ইহার গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। প্রতিটি বীজই সম আকার-আয়তন ও

সুপরিপক্ক এবং সুষ্ঠ অংকুরউদ্গমক্ষম হইলে পরবর্ত্তী ফসলে উহার অবশ্য প্রভাব থাকে। জমি তৈরী করার সময় ফসফরাস সারের সঙ্গে পরিমিত পটাশ সার প্রয়োগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। লাইনে বীজ বোনার পরবর্ত্তী পরিচর্য্যা যদি ঠিক ভাবে হয় তবে শিম্ব জাতীয় বীজ উৎপাদনে ফলের পরিপক্কতার ব্যবধানকে অনেকটা সংক্ষিপ্ততম করা খুবই সম্ভব। যেমন বীজ বোনার ৩ সপ্তাহ পরে একটা হাল্কা সেচ দিয়া দিলে গাছের বাড়ন প্রায় সমহারে হয়। ফুল আশার মুখে যদি একটা হাল্কা সেচ দিয়া দেওয়া যায় তবে সব গাছেরই ফুল প্রায় একই সময় বাহির হইয়া আসিবে সুতরাং ফুলের গর্ভধানের কাজও প্রায় একই সময়ের মধ্যে সম্পাদিত হইবে। ফল ধারণ ও ফলের পরিপক্কতার কালও প্রায় সমভাবে থাকিবে।

গুয়ারা ও বরবটি ইত্যাদি শিম্বজাতীয় ঘাসের বীজের ছড়া সহসা ফাটিয়া যায় না বা বীজ ঝড়িয়া পড়িয়া যায় না কিন্তু ফ্যাসুলাস জাতীয় খাস গাইমুগ, বিশালমুগ ইত্যাদি ফলের ছড়া পরিপাক্ক হইলে সহসা ফাটিয়া যায় এবং বীজ মাটিতে ঝড়িয়া পড়ে। এই কারণে বিশাল মুগের ফলন তোলার প্রকৃষ্ট সময় ভোর বেলায় মানে সূর্য সতেজ হইয়া উঠিবার আগে। রাতের ঠাণ্ডা হাওয়া অর্থাৎ রাত্রিকালীন হাওয়ায় আর্দ্রতা বেশী থাকায় পরিপক্ক ছড়াগুলি বেশ একটু নরম হইয়া আসে কিন্তু সূর্য্যলোক প্রখর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই নমনীয়তা হারাইয়া ফেলে কারণ রাত্রীকালীন গৃহীত আর্দ্রতা শুষ্ক হইয়া যায়। গাই মুগ বা বিশাল মুগের কেবল পাকা ছড়া গুলি হাতে তুলিয়া আনিয়া বীজ উৎপাদনে বীজের মান উন্নত হয় বটে কিন্তু উহা খুবই ব্যয় সাপেক্ষ। আপন কৃষিতে ব্যবহারের জন্য স্বল্প পরিমান বীজ এই পদ্ধতিতে সংগ্রহ করিয়া লওয়াই বিধেয়।

গাই মুগের চাইতে বিশেল মুগের ছড়া আরও তাড়াতাড়ি ফাটিয়া যায়। বীজ তুলিবার ক্ষেত্রে গাইমুগ যতটা অসমপরিপক্ক থাকিবে বিশালমুগ তার চাইতে বেশী অসম থাকিবে। সয়াবীন ও গুয়ারা ঘাসে অসমপরিপক্ক ছড়া কিছু থাকিলেও বীজ উৎপাদনে কোনও ব্যাঘাত জন্মায় না কারণ উহা সহসা ফাটিয়া যায়না। বরবটি বীজের বেলায় উহার ছড়া পুরু ও মাংসল হওয়ার দরুন শুকাইতে বেশ সময় নেয় সুতরাং উহার পরিপক্কতা অসম হইয়া থাকে। বরবটির ছড়া সহসা ফাটিয়া যায়না বটে কিন্তু অতিরিক্ত শুষ্ক হইলে ছড়া ফাটিয়া যায় ও বীজ মাটিতে ঝড়িয়া পড়ে। বরবটি গাছে যখন প্রথম ফলন পাকিতে আরম্ভ করে তখনও গাছ ফুল বাহির করিতে থাকে ও ফল ধরিতে থাকে এমন অবস্থায় বরবটি গাছের বীজ সংগ্রহ করিতে সুপক্ক ছড়াগুলি হাতে

তুলিয়া আনাই কর্তব্য। ইহাতে জন মজুর বেশী লাগে ফলে খরচও কিছু বেশী হয় তবে এমন অবস্থায় খামারের স্থায়ী মজুর বিকালের দিকে বরবটি মাঠে ঘুড়িয়া ঘুড়িয়া সুপক্ক ছড়াগুলি হাতে তুলিয়া আনিলে বাড়তি খরচের বোঝা চাপে না। প্রতিদিন এমন সংগৃহীত বীজের ছড়াগুলি সংরক্ষিত পরিচ্ছন্ন বীজ উৎপাদন মেঝেতে রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়। ঠিক ভাবে শুকাইয়া গেলে হালকা ভাবে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মাড়ানো সহজ হয় ও ইহাই গ্রাম বাংলার প্রচলিত রীতি। সাধারণতঃ বিকালের দিকেই বীজ মাড়ানো হইয়া থাকে। এমনিভাবে সংগৃহীত বীজের মান অনেকটা সংরক্ষিত হয়। গাইমুগ ও বিশাল-মুগের বীজ সংগ্রহের ব্যাপার অনেকটা ভিন্নরূপ। পাকা ফল শুদ্ধ গাছ তুলিয়া আনিয়া বীজউৎপাদন মেঝেতে ভালভাবে শুকাইয়া লইয়া মাড়াই করিতে হয় এবং পরে ঝাড়াই করিয়া লইতে হয়। ফলগুলি অসম পরিপক্ক অবস্থায় থাকে বলিয়া উৎপাদিত বীজের মান সংরক্ষণে তেমন সমতা থাকে না তথাপিও ইহাই প্রচলিত রীতি পদ্ধতি। ওটস ঘাসের বীজ ফেব্রুয়ারী মাসের পাকা ফসল গম ঝাড়াই করার মত ঝাড়াই করিয়া লইতে হয়! জোয়ার, টিওসিনটি ইত্যাদির বীজ সেপ্টেম্বর অক্টোবরে পাকিবার পর মাড়াই অথবা ঝাড়াই করিয়া লওয়া চলে। পরিচ্ছন্নভাবে ঝাড়াই-মাড়াইর পর বীজ হাওয়ায় উড়াইয়া ভূষা, ধূলা, বালি ও অবাঞ্ছিত দ্রব্যগুলি বাহির করিয়া লইতে হয়। হাওয়ার গতি জোরালো থাকিলে বিপরিত দিকে মুখ করিয়া উঁচু থেকে বীজ আস্তে আস্তে ছাড়িলে ভূষা ও অবাঞ্ছিত অপেক্ষাকৃত হালকা পদার্থগুলি আলাদা হইয়া যায়। হাওয়ার জোর কম থাকিলে কুলো দিয়া জোর হাওয়া লাগাইবার রেওয়াজ গ্রাম বাংলায় প্রচলিত আছে। পরিচ্ছন্ন বীজ এবার ক্রমাগত কয়েকদিন রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয় যেননা বীজ এমন ভাবে শুষ্ক হয় এবং কোনও প্রকার অধিক জলীয় অংশ ইহাতে না থাকে। ভালভাবে শুকনো বীজে সহস ছত্রাক জন্মায় না। জলীয় অংশ থাকিয়া গেলে ছত্রাক জন্মাইবার সম্ভবনা থাকিয়া যায় এবং ভ্রূণের সুপ্তি কালেই অপমৃত্যু ঘটাইয়া দেয়।

পশ্চিম বাংলার আবহাওয়ায় বারসীম বীজ সংগ্রহ করা যদিও বা কিছুমাত্র সম্ভব লুসার্ণ বীজ সংগ্রহ করা মোটেই সম্ভব নহে কারণ লুসার্ণ বীজের দানাগুলি একই সঙ্গে পরিপক্ক হয় না বলিয়া বীজ সংগ্রহ খুবই ব্যায় সাপেক্ষ হয়। লুসার্ণ বীজের পরাগ সংযোগকারী পতঙ্গ পশ্চিমবাংলায় দেখা যায় না। বারসীমের নাবী ফসল অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসে বোনা ফসলের প্রথম কাটিং নেবার পর ঐ ফসল থেকে এপ্রিল মাসে বীজ অল্প কিছু পাওয়া গেলেও উহার

মান ও পরিমাণ খুবই নিম্ন ও অল্প, উচ্চ আদ্রতা যুক্ত আবহাওয়াই ইহার কারণ। পরবর্ত্তী ফসলের জন্য ও ভাল ফলনের জন্য ঐ বীজ ব্যবহার করা নির্ভর যোগ্য হয়না। বিশেষ করিয়া এপ্রিল মাসে পাকা বীজে যদি বৃষ্টির জল পাইয়া থাকে তবে উহার রং কালচে হইয়া যায় ও স্বাভাবিকত্ব অনেকটা নষ্ট হইয়া যায়। পশ্চিমবাংলায় প্রতি বছর ভিন্ন রাজ্য থেকে আমদানী করা বারসীম ও লুসার্ণ বীজ দিয়াই চাষ হইয়া থাকে।

উপযুক্ত ভাবে শুকনো বীজে কীটনাসক ঔষধ মিশাইয়া বীজাধারে সংরক্ষণ করুন। শষ্যদানা ভালভাবে পরিষ্কার করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া ঠাণ্ডা করিয়াই গোলাযাত করা উচিত। ভালভাবে শুকনো না হইলে অথবা বীজ আদ্রর্তাযুক্ত থাকিলে ছত্রাক জন্মায় এবং বীজের অংকুরোদ্গম ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায়। সাধারণত গ্রাম বাংলায় প্রান্তিক চাষি ভাইয়েরা মাটির কলসী বা হাড়িতে বীজ সংরক্ষণ করিয়া থাকেন। মাটির কলসী বীজধার হিসাবে ব্যবহার করিতে হইলে উহা পরিষ্কার করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয় এবং প্রায় সংগে সংগে মাটির কলসীর বাহিরের দিকে আগাগোড়া পিচ্ দিয়া ভাল করিয়া লেপিয়া দিতে হয়। ফলে ঐ মাটির হাড়ির বা কলসী বাহিরের আদ্রর্তা টানিয়া লইতে পারে না এবং সহসা ভিজিয়া যাইতে পারে না। সম্পন্ন চাষিরা মাটির তৈরী এবং টিনের তৈরী বীজধার ব্যবহার করেন। আবহাওয়ার প্রতিকূল অবস্থা ও কীটপতংগের হাত হইতে বীজকে রক্ষা করার জন্যই বীজাধারের প্রয়োজন। কৃষির গোড়া থেকে সকল দেশেই বীজ সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রচলন চলিয়া আসিতেছে। বীজাধারে বীজ সংরক্ষণের সময় ভালভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয় বীজধার সম্পূর্ণরূপে আদ্রর্তামুক্ত এবং শুকনো রহিয়াছে। বীজধারে কোনও প্রকার কীট অথবা ছত্রাকের অস্তিত্ব না থাকা এবং কীটনাশক ঔষধ দিয়া বীজাধার শোধন করিয়া লওয়া অবশ্য কর্তব্য।

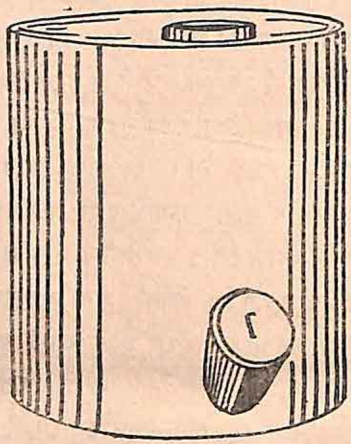
বীজধার যেই ঘরে সংরক্ষিত হয় সেই ঘরের মেঝে এবং দেওয়াল স্যাঁতস্যাতে না হয় এবং সেই ঘড়ের উপর আবহাওয়ার প্রতিকূল প্রভাব না থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয় কারণ তেমন প্রতিকূল অবস্থার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সংরক্ষিত বীজধারের উপরও দেখা দিতে পারে। মেঝে সিমেন্টের হওয়াই বাঞ্ছনীয় এবং উহাতে কোনও ভাঙা বা ফাটল না থাকে। পাকাবাড়ী হইলে দেওয়াল বা ছাদের ফাটল থাকিলে ভাঙ্গা যায়গাগুলি মেরামত করিয়া লইতে হইবে, যাহাতে

গুদামঘর আর্দ্রতামুক্ত হয় এবং বৃষ্টির জল চোয়ানোর উপায় না থাকে। এই সকল কারণে খোলা জায়গায় যেখানে সর্ব্বদা গাছের ছায়াযুক্ত নয় ও পর্যাপ্ত সূর্য্যালোক পায় তেমন স্থানের ঘড় বীজধার সংরক্ষণের জন্য উপযোগী।

বীজধার মেঝের উপর সরাসরি না রাখিয়া বাঁশ অথবা কাঠ দিয়া মাচা তৈরী করিয়া উহার উপর বীজাধার রাখাই সমীচিন কারণ উহাতে মেঝের স্যাঁতানি বা আর্দ্রতা শষ্যাধারগুলিকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে না। দেওয়াল থেকেও বীজধারগুলি দূরে রাখা উচিত। যেই ঘরে বীজাধার সংরক্ষিত হয় সেই ঘরে কীটনাশক ঔষধ এবং সার না রাখাই বাঞ্ছনীয় কারন উহার প্রতিক্রীয়া সংরক্ষিত বীজের উপর না পরে। ঘড়ের জানালা ও ঘুলঘুলি এমনই হবে যাহাতে প্রয়োজন অনুযায়ী বন্ধ করিয়া দিয়া গুদাম ঘরটিতে সম্পূর্ণরূপে বৃষ্টি বা বাতাস প্রবেশ রোধ করা যায়। গুদাম ঘরে হাওয়া বদলাইবার সংগে সংগে যতবার সম্ভব বীজ নাড়াচাড়া করিয়া দেখা উচিত এবং যদি সন্দেহ হয় যে বীজ গরম হইয়া উঠিয়াছে তবে উহা বীজধার হইতে ঢালিয়া নাড়াচাড়া করিয়া দিতে হয় এবং উহা শুকনো খটখটে দিনে করাই ভালো। মাটির কলসী বা ধাতব বীজাধারে বীজ সংরক্ষণের সময় ই ডি বি (ইথিলিন ডাই ব্রোমাইড) এম্পুল দিয়ে রাখুন, উহাতে কীট পোকামাকড় জন্মায় না এমন কি পোকা মাকড়ের ডিম পর্যন্তও উহাতে নষ্ট করিয়া দেয়। ইহা এক ধরণের গ্যাস বা ধোয়া জাতীয় বিষাক্ত ঔষধ। দুইটি কাঠি দিয়া ধরিয়া বীজাধরে সংরক্ষিত বীজের মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া চাপ দিয়া এম্পুলকে ভাঙ্গিয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে বীজাধারের ডালা বন্ধ করিয়া দিন। এ্যাম্পুল ভাঙ্গিয়া দিবার সময় একটু সতর্ক থাকিতে হয় যেন ঐ ধোয়া যা গ্যাস প্রয়োগকারীর নাকে মুখে না লাগে। এমন বন্ধ অবস্থায় ৭ দিন রাখিয়া দিন অথবা দরকার না হওয়া পর্যন্ত বন্ধ অবস্থায় রাখতে হবে। ই,বি, ডি, এমনই একটি রাসায়নিক পদার্থ যা হাওয়ার স্পর্শে গ্যাসে পরিণত হয় এবং গন্ধ ভয়ানক তীব্র তবে কিছু পুড়িয়া যায় না, গায়ের চামড়ার লাগিলে ফোষ্কা মতন হয়। ই, ডি, বি, ইন্‌জেকশনের এ্যাম্পুলের মত শীল করা অবস্থায় বাজারে পাওয়া যায় এবং একটি ৩ মিলিমিটারের এ্যাসপুল ১ কুইন্টাল পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণে সক্ষম।

ধাতব পাত্র অথবা বীজধার টিনের নির্ম্মিত হইলে ইঁদুরের অশ্রুমণের ভয়

একেবারেই থাকেনা। পোকা মাকড়ের আক্রমণও নিয়ন্ত্রণ করা খুবই সম্ভব



ধাতব নির্ম্মিত বীজাধার

হয় কারণ এগুলোতে কীটনিরোধক গ্যাস বা ঔষধ প্রয়োগ করা সহজ।

যদি পাত্রের নিচের দিকে খোলার ব্যবস্থা থাকে, তা'হলে সাতদিন বাদে সেখান থেকে শস্যদানা নেওয়া চলে এবং পাত্রের উপরের দিকের শস্যদানা নাড়াচাড়া করতে হয় না। এইজন্য বীজ সংরক্ষণে ধাতব পাত্র বিশেষ উপযোগী কেননা উহার নীচের দিকে শস্যদানা বাহির করিবার সুব্যবস্থা থাকে।

এক মরশুমের উৎপাদিত বীজ পরবর্তী মরশুমেই ব্যবহার করিয়া ফেলিতে হয়, আর এই মধ্যবর্ত্তী সময়টুকু সতর্ক থাকা দরকার যেন বীজ তাহার জীবনি শক্তি ও সৃজন ক্ষমতা না হারায় এবং কীট ও পোকা মাকড়ের হাত হইতে রক্ষা পায়। প্রকৃতিদত্তভাবে বীজের সৃজন ক্ষমতা যেমন রহিযাছে উপযুক্ত সংরক্ষণে তাহার প্রায় সবটাই বজায় রাখা সম্ভব।

পরিশিষ্ট

তথ্য সূত্র

Feed and Feeding.	—Morrison.
Forage Crops of India.	—I. C. A. R
General Botany.	—Mukherjee & Ganguly.
Krishi-O-Jeeb Vigyan.	—Ghose & Mazumder.
Dairyman.	—October 1974.
Technical Co-operation	The Deptt. of Animal Nutrition, Haryana Agricultural University. Hissar.
Crop Photographs	1. The Regional Forage Research Station, Kalyani. Nadia.
	2. Ramkrishna Mission Ashram, Narendrapur. 24—Parganas.

গো আ জা লা কা

অসতর্কতা ও মুদ্রণ জনিত বানান
পরবর্ত্তী সংস্করনে সংশোধিত হইবে।